স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন।

এম.ফিল গবেষণা সন্দর্ভ

Dhaka University Library
401831

গবেষক

শামসুন্নাহার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ২১৫
সেশনঃ ১৯৯৭-৯৮

401831

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অক্টোবর, ২০০৪

M.Phil M.

401831

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন।

GIFT

401831

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে, “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি শামসুন্নাহার-এর একক ও নিজস্ব গবেষনার ফলশ্রুতি।

আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত আমার তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে এবং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দেয়ার সুপারিশ করছি।

401831

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তাসনিম সিদ্দিকী

ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী
অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, তথ্য সরবরাহ ও আন্তরিক সহযোগিতার কারণে আমার গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন তত্ত্বাবধায়ক ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী ম্যাডামকে স্মরণ করতে চাই। ম্যাডামের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। কেননা গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে ম্যাডামের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও মূল্যবান দিকনির্দেশনার ফলেই গবেষণাকার্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মণ, চেয়ারম্যান, পিচ এন্ড কনফ্লিক্ট স্ট্যাডিজ বিভাগ স্যারদের প্রতি আমি বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণার বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী ও পুরুষ সদস্যসহ স্থানীয় এলাকার লোকজন আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে তথ্য সরবরাহ করে গবেষণাটি সম্পাদন করতে যে অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এছাড়া যেই সমস্ত পুস্তক, প্রবন্ধ, ম্যানুয়েল, গবেষণা রিপোর্ট ইত্যাদির তথ্য সমূহ আমার গবেষণা কার্যটিকে সমৃদ্ধ করেছে সেই সমস্ত প্রবন্ধ রচয়িতার কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমার বাবা-মা, স্বামী, ছোট ভাই ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

কারণ তাদের অনুপ্রেরণা ও তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অকৃত্রিম সহযোগিতার ফলে আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” বিষয়ক গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী সদস্যদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রটি আরো কার্যকরী ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখতে পারলেও আমার গবেষণাকার্যটি সার্থক হবে। আশা করি প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত বিপুল সংখ্যক নারী জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক তথ্য সম্বলিত এই গবেষণা প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার কাঠামো ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়   শামসুন্নাহার
অক্টোবর, ২০০৪

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মবিমুখ রেখে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা, নারী নেতৃত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রত্যয়গুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বরং নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সর্বপ্রথম নারী সদস্যদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন কার্যকরী করা হয়। “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক গবেষণায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীরা অংশগ্রহণ করায় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কিভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় সে সম্পর্কিত সুপারিশ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়সমুহ তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রথম বারের মত বিপুল সংখ্যক নারী দেশের ও সাধারণ জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসেন। সে বছর সারাদেশে পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০ জন নারী চেয়ারম্যান এবং ১১০ জন নারী সাধারণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত

হয়েছেন। এছাড়া সংরক্ষিত আসনে ১২ হাজার ৮ শত ২৮ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন [সূত্রঃ ক্ষমতায়নে নারী, প্লাজ]।

প্রথম বারের মত নারী নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে। কিন্তু যতটা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তারা ইউ.পি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন অচিরেই তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে। নারীদের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন, হুমকি ও চাপ সৃষ্টি হতে থাকে কাজের ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা, অসহযোগিতা তাদের কাজের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া নারী সদস্যদের অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতা ছিল তাদের সুষ্ঠু ভাবে কার্যসম্পাদনের অন্তরায়। গবেষণা কার্যসম্পাদনের জন্য ফরিদপুর সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ৩৩ জন মহিলা সদস্য এবং ২৪ জন পুরুষ সদস্যের মতামত দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এভাবে সংগৃহীত তথ্যসমুহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সুপারিশ বের হয়ে আসে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উভয় মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হতে যে সাধারণ চিত্র ফুটে উঠে তাতে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউ.পি নারী সদস্যরা উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকারী ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এলাকার ট্যাক্স আদায়ের সাপেক্ষে যে ভাতা পান তাতে অনিয়ম রয়েছে। মহিলা সদস্যদের প্রত্যেকেই বলেন ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত। অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত ভাতার কারণে তারা যেমন কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে তেমনি ইউনিয়ন পরিষদে যাতায়াত খরচও বহন করা সম্ভব হয়না বলে জানিয়েছেন। এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে ৬০% মহিলা সদস্য মোটামুটি ভাবে জবাব দিতে পেরেছেন। তবে প্রথম বারের মত

নির্বাচিত হওয়ায় এবং কাজ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় শুরুর দিকে কাজ বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়েছে বলে সবাই জানান।

কাজ করার ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের সাহায্য পান কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানান, সাধারণ কাজ কর্মের ব্যাপারে পুরুষ সদস্যরা তাদের সাহায্য করেন। কিন্তু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে চেয়াম্যান সহ পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সভাগুলোতে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের অবমূল্যায়ন করা হয়। পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সঠিক ভাবে করতে পারছেন না। এজন্য তারা নারীদের পারিবারিক চাপ, অদক্ষতা ও অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের কাজ করতে গিয়ে শারীরিক ভাবে কেউ নির্যাতিত হননি বলে জানান। তবে ৫০% নারী সদস্য জানিয়েছেন কাজ করতে গিয়ে পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। পুরুষ সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় নারী সদস্যরা পারিবারিক কাজেই বেশি সময় ব্যয় করেন। পরিবারের কাজের জন্য তারা ইউনিয়ন পরিষদের কাজে বেশি সময় দিতে পারেন না।

নির্বাচনের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল নারী সদস্যদের পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। নারী সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় অর্থনৈতিক ভাবে তারা প্রায় সকলেই স্বচ্ছল। তাদের প্রত্যেকেই নারী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় গর্ব বোধ করেন এবং এর ফলে সমাজে তাদের সম্মান এবং পরিচিতি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান। বাজেট এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কমিটি

সম্পর্কে তাদের ধারনা খুব কম। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সবাই নেতিবাচক উত্তর দেন। কেউ কেউ জানিয়েছেন এজন্য তাদের অনেক সময় গ্রামের জনগণের কাছ থেকে কটুক্তি শুনতে হয়। সঠিক ভাবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণের দরকার আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সবাই ইতিবাচক উত্তর দেন। ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সবাই বলেছেন কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে, ভাতা বৃদ্ধি করলে এবং নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করার সুযোগ থাকলে জনগণ তাদের পুনরায় ভোট দিবে এবং তারাও নির্বাচন করার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন।

প্রশ্নপত্র ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যে সকল সমস্যা ও ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে তার ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সুপারিশগুলোর মধ্যে নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা, ভাতা বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ সম্পর্কে অবহিত করা, বাজেট ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ বন্টন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন সমাজের উন্নয়নে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এ গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীরা সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন এবং দেশ ও জনগণের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবেন।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা নম্বর**

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১
গবেষণার উদ্দেশ্য ৪
গবেষণার পদ্ধতি ৬
গবেষণার মূল প্রশ্ন ৮
গবেষণার প্রত্যয় বিশ্লেষণ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন ১২
ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ ২১
ইউনিয়ন পরিষদের গঠণপ্রণালী ৩৩
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ৩৫
নারীর ক্ষমতায়ন ৩৯
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৪১
ইউনিয়ন পরিষদের নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস ৪২

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারীদের অংশগ্রহণ ৪৮
ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যর দায়িত্ব ৪৯

ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা ৫৩

নির্বাচিত নারী সদস্যদের বর্তমান পরিস্থিতি ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা এলাকার পরিচিতি ৫৯

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৬১

ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সমস্যা উদঘাটন, প্রাপ্ত সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৬৮

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

সমস্যা সমাধানের উপায় বা সুপারিশ ৮০

উপসংহার ৮৫

পরিশিষ্ট ৮৮

গ্রন্থপঞ্জী ৯৮

==========

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে "নারীর ক্ষমতায়ন" ধারণাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের যে প্রান্তিক অবস্থা বিরাজমান তা সুষম রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সমার্থক নয়। তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের বিষয়টির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান সংশ্লিষ্টকরণ ও তা জোরদার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে মহিলারা শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেই দেশ ও সমাজে তারা প্রকৃত মর্যাদা পাবে এবং দেশের কাংখিত উন্নয়ন সাধিত হবে। মহিলাদের কর্মসংস্থান ও শিক্ষা গ্রহণ সহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রদায়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত যে দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে পশ্চাদমুখী ও উন্নয়ন বিমুখ রেখে কোন স্থায়ী উন্নয়ন সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে না। বাংলাদেশের সংবিধানেও তাই মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে"। ১০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে" [সূত্রঃ রহমান, ডিসেম্বর, ১৯৯১]।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের মধ্যে যে ব্যাপক অসমতা রয়েছে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশনা দিয়েছে যা সংবিধানের ২৭, ২৮(২), ২৮(৪), ২৯(১ ও ২) এবং ৩২নং ধারায় উল্লেখ করা আছে। এসব ধারা অনুযায়ী জাতীয় উন্নয়নের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। সংবিধান উপরোক্ত ধারাগুলির মাধ্যমে নারীর প্রতি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের বৈধতা প্রদান করেছে, যাতে নারীর নাগরিক ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা যায়। তবে সরকারের রাজনৈতিক অধিকারের উপরই নির্ভর করে নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার প্রকৃত বাস্তবায়ন [সূত্রঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, মার্চ, ১৯৯৫]।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা পুরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাই জাতীয় পর্যায়ের মতো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে মহিলাদের স্থানীয় পর্যায়েও সম্পৃক্ততা বা প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কারণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোই রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম দ্বার, যেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের বেলায় দেখা গেছে যে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুরুষদের আধিপত্য বিদ্যমান।

১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ১৩৫ বছর পরেও স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলো প্রধানত পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ভোটাধিকারই ছিলনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ

নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রচলন ছিল না। স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসন রাখা হত। সংরক্ষিত আসনে নারীরা পুরুষদের ইচ্ছায় মনোনীত হতেন। মূলতঃ রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া তাদেরকে কার্যত পুরুষদেরই অধীনস্থ করে রাখে। সাম্প্রতিককালে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের অন্তর্ভূক্তি নারীজগতের এক সাফল্যজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সেবারই প্রথম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। সারা দেশে পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০ জন নারী চেয়ারপারসন এবং ১১০ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। এছাড়া সংরক্ষিত নারী আসনে ১২ হাজার ৮২৮ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং জনমানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাদের প্রত্যাশা পূরণে নারী সদস্যরা যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সেজন্য তাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর যথার্থ ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার গুণগত পরিবর্তনসহ সুফল ভোগ করার সুযোগ দিয়েছে কিনা তা অনুসন্ধানের দাবী রাখে। কেননা নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সরকারী এ উদ্যোগকে

সকলে স্বাগত জানালেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। গণতন্ত্র চর্চার প্রারম্ভিক স্তর ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন বাধায় সম্মুখীন হচ্ছেন। তাছাড়া অসহযোগিতা, অদক্ষতা, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বাধা ও চাপ তাদের কাজ করার ক্ষেত্রটিকে আরো সংকুচিত করে তুলেছে। এ পরিস্থিতিতে আমি “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত ১১টি ইউনিয়নের ৩৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং ২৪ জন পুরুষ সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর গবেষণা করি। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে নারীরা কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাদের কাজ করতে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় কি, জনগণের মধ্য থেকে কি ধরনের সুপারিশ এসেছে এবং উক্ত সুপারিশসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী ক্ষমতায়ন কতখানি কার্যকর করা সম্ভব হবে সে বিষয়গুলিই “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর ভূমিকা অনেক। কিন্তু ক্ষমতায়ন সীমাবদ্ধ। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্ব এদেশের নারী অধিকার আদায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারীর প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ গ্রাম পর্যায়ে ছিল এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

কিন্তু নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সরকারী এ উদ্যোগকে যতটা আশাব্যঞ্জক বলে সর্বস্তরে সমাদৃত হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে আমাদের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তার ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। নারী সদস্যরা যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাতে ভাটা পড়তে থাকে । তাদের আশা-আকাংখা পূরণ না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করতে শুরু করে । নির্যাতন, হুমকি, অসহযোগিতা, কাজ না দেয়া ও অবমূল্যায়নের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে । এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা আদৌ কাজ বুঝেনা, স্বামীরা কাজ করে দেয়, অনেক সদস্যকে একদিনও ইউনিয়ন পরিষদে দেখা যায়নি ইত্যাদি । পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও তারা দায়িত্ব পালনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । তারা তাদের ভাতা ঠিকমত পান না । তারা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সভায় তুলে ধরলে চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে সমাধান করতে পারেন না । পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সরকারী নির্দেশনাবলী না পাওয়ার কারণে তারা যেমন তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানেন না, তেমনি তারা যে পরিবেশে কাজ করছেন সেটাও তাদের জন্য প্রতিকূল। মোট কথা ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ভূমিকা পালনে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। এহেন পরিস্থিতিতে কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে “স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন” বিষয়ে গবেষণা করা হয়। উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- ☐ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা তাদের কাজ ঠিক মতো করতে পারছেন কিনা তা যাচাই করা।

- ☐ তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের ধাপ কোন স্তরে তা অনুসন্ধান করা।
- ☐ নারীর ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের ভূমিকার মাত্রা নিরূপণ করা।
- ☐ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলো চিহ্নিত করা।
- ☐ নারী সদস্যদের সমস্যা সমূহ দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করা।
- ☐ ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রায়নে ইউপি নারী সদস্যদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকসমূহ চিহ্নিত করা।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ

"স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন" বিষয়ক গবেষণাটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমি মূলতঃ দু'টি পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যথাঃ-

(১) প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

(২) সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত ৩টি উপায়সমূহের অনুসরণ করতে হয়।

- ❑ ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদ
- ❑ প্রশ্নপত্র পূরণ
- ❑ দলীয় আলোচনা

❑ ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদ ঃ

ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্য, পুরুষ সদস্য, চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় কিছু লোকজনকে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় । যেমন- নির্বাচিত নারী সদস্যরা ঠিকমত কাজ করতে পারছে কিনা, স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে কিনা, পুরুষ সদস্যদের সাথে কাজ করতে কোন বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা ইত্যাদি । এসব প্রশ্নের উত্তর থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয় ।

❑ প্রশ্ন পূরণ পদ্ধতি ঃ

আমার গবেষণাধীন এলাকার নির্বাচিত নারী ও পুরুষ সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয় । প্রশ্নপত্রে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা, ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখা হয় । যেগুলোর উত্তর হতে গবেষণার তথ্য বের হয়ে আসে ।

☐ দলীয় আলোচনা ঃ

দলীয় আলোচনার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয় সদস্যই অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয় সদস্যেরই তাদের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ ব্যক্ত করার সুযোগ রাখা হয়। আলোচনাকালীন সময়ে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডের অনেক বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া নারীরা নির্বাচিত হওয়ায় পুরুষদের কি প্রতিক্রিয়া সেটা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ, ম্যানুয়েল ও গবেষণা রিপোর্ট ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়। এ সকল পুস্তকাদিতে স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্বলিত যে সকল তথ্য বর্ণিত আছে তা আমার গবেষণাকার্যটিকে সমৃদ্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষণার মূল প্রশ্ন ঃ

গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য কতগুলো প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয় যার উত্তরসমূহ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তুলে এনে গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়।

(১) ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে কতটুকু হচ্ছে?

(২) এই ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীরা কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন?

(৩) ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নির্বাচিত নারী সদস্যরা তাদের নির্ধারিত কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারছে কিনা ?

(৪) নারী সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণ কী ?

(৫) কোন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে ?

(৬) নারী সদস্যরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে?

(৭) প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতি নারী সদস্যদের ক্ষমতা প্রয়োগের অন্তরায় কিনা?

(৮) ইউপি নারী সদস্যদের উপর স্থানীয় জনগণের মনে অনাস্থা তৈরী হচ্ছে কেন?

(৯) উদ্ভূত সমস্যা সমূহ সমাধানের উপায় কী?

(১০) যথাযথ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সাফল্যের সম্ভবনা কতটুকু?

গবেষণার প্রত্যয় বিশ্লেষণ ঃ

"স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন" বিষয়ক গবেষণাটির প্রত্যয়গুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

স্থানীয় সরকার ঃ স্থানীয় সরকার ধারণাটি প্রাচীন। সরকারের উন্নয়নমূখী কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারের পক্ষে

রাজধানী/কেন্দ্রে অবস্থান করে দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং এর সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এজন্য জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে কম গুরুত্বপূর্ণ ও স্থানীয় ধরণের সমস্যাসমূহ সমাধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জাতীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে সাধারণতঃ প্রশাসনিক ইউনিট পর্যায়সমূহে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনির্ধি কর্তৃক যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাই স্থানীয় সরকার। আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সেটি বিশ্লেষণ করাই উক্ত গবেষণার মূল লক্ষ্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ নারীর ক্ষমতায়ন গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একারণেই বর্তমান বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয়তাই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় হিসাবে বিবেচ্য হচ্ছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে এবং একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের পদবৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় আনা হয়েছে। এ বিষয়টিকে এ গবেষণায় ক্ষমতায়ন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে দায়িত্ব পালনে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি-না, হলে কী ধরনের সমস্যা এ বিষয়টিকেই গবেষণায় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার দু'বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে নারীর ক্ষমতায়নের যে ক্ষেত্রে তারা পদার্পণ করেছেন সেখানে তারা থাকবেন কি-না, থাকলে তারা কোন পদে ও কোন পরিবেশে থাকতে চান সে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এ গবেষণায়। নারীর ক্ষমতায়নে ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কি এ বিষয়টিকে সম্ভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ

প্রাচীন বাংলায় তিন ধরনের স্থানীয় সরকার বা শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার ছিল এক ধরনের প্রশাসন সংগঠন, যেখানে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্থিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাশালী ছিল এবং স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রূপে কাজ পরিচালনা করতো। তৃতীয়তঃ কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিযোগীতা চলতো। ধারনা করা হয় যে, বড় রাজ্য গুলোর আবিভারে পর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠদশক পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়া স্থানীয় সরকার দেশ শাসনের মূল ভিত্তি রূপে প্রবর্তিত ছিল [সূত্রঃ ডঃ কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার, ১৯৮৯]।

স্থানীয় সরকার একটি অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সরকারের উন্নয়নমূখী চিন্তাধারা উন্মেষের সংগে সংগে এই ধারনার ব্যাপকতা এবং গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের পক্ষে রাজধানীতে অবস্থান করে দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বহুমুখী সমস্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয় বিধায় স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবী। কোন একটি ভৌগলিক সীমারেখায় স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সৃষ্ট অথবা অনুমোদিত সংস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে। International Encyclopedia of the Social Science-এ বর্ণিত আছে "Local Government is a public organization

authorized to decide and administer a limited range of public policies within a relatively small territory which is a subdivision of a regional or national government." [সূত্রঃ International Encyclopedia of the Social Science, Volumes 9 & 10].

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্থানীয় সরকারের ধারনা বিকেন্দ্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বিকেন্দ্রীকরণে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে বিভক্ত করে দেশের প্রত্যন্ত ভৌগলিক এলাকায় ভাগ করে দেয়া হয়। এই ব্যবস্থা সরকারী কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ডঃ কামাল সিদ্দিকী রচিত 'Local Governance in Bangladesh' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "Governance has been defined as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development (World Bank, 1994) [সূত্রঃ Kamal Siddique, Local Governance in Bangladesh, 2000].

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- ☐ এটি রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর যে কোন এলাকায় সরকারী নীতি কার্যকর করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ☐ এটি সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা পরিচালিত একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান।

- ☐ এটি স্থানীয় পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ☐ একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান।
- ☐ এটি কর আরোপ ও আদায়ের জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ☐ সর্বোপরি এটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

স্থানীয় সরকারের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

- ☐ যে ব্যবহারিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।
- ☐ প্রতিটি ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর হস্তান্তরিত ক্ষমতার ধরণ।
- ☐ যে পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।
- ☐ এরূপ ক্ষমতা, প্রতিটি পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় অবস্থিত যে সকল ব্যক্তি, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং
- ☐ যে সকল আইন এবং প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো

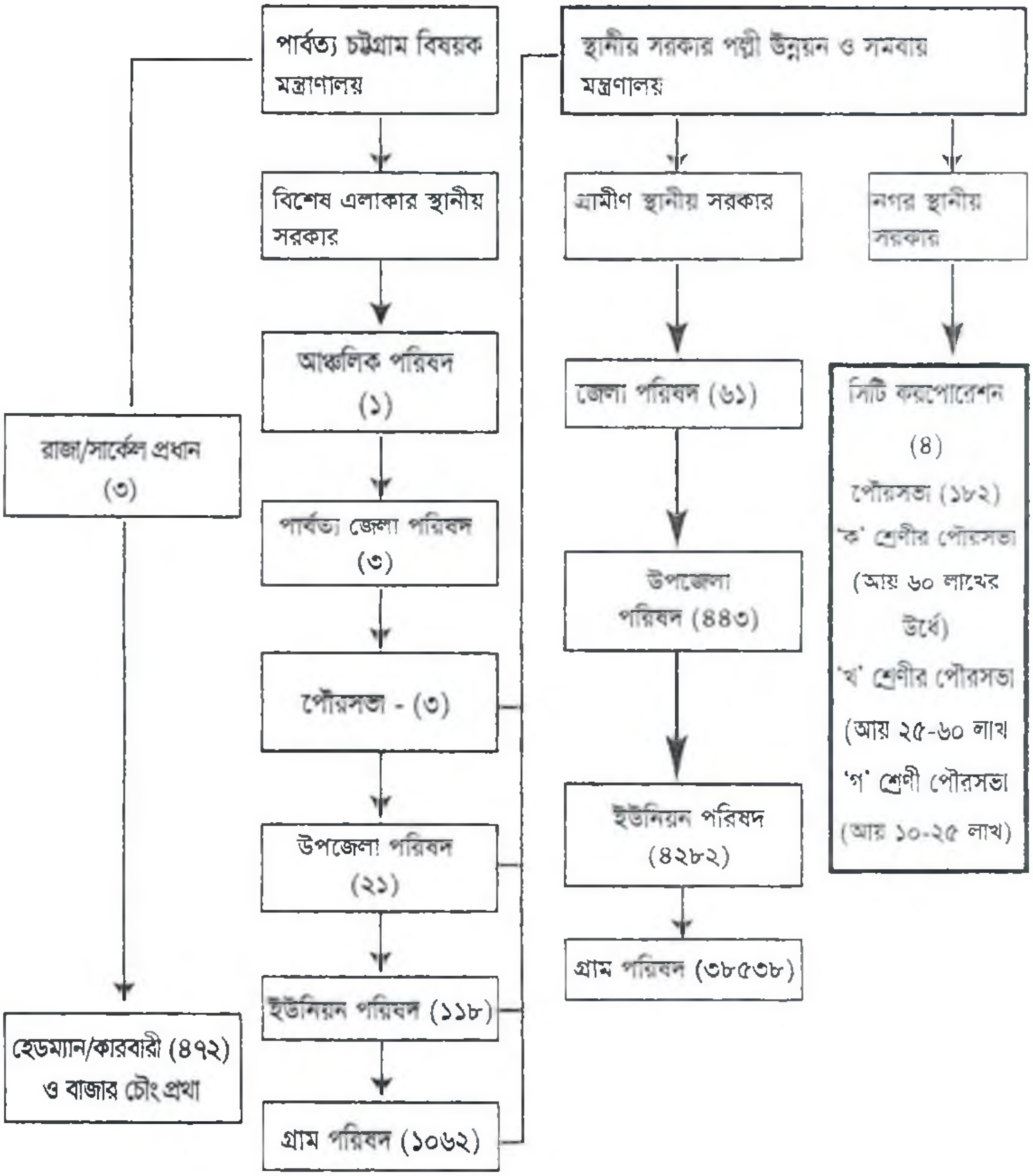
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বিশেষ এলাকার স্থানীয় সরকার
গ্রামীণ স্থানীয় সরকার
নগর স্থানীয় সরকার
আঞ্চলিক পরিষদ (১)
জেলা পরিষদ (৬১)
সিটি করপোরেশন (৪)
পৌরসভা (১৮২)
'ক' শ্রেণীর পৌরসভা (আয় ৬০ লাখের উর্ধে)
'খ' শ্রেণীর পৌরসভা (আয় ২৫-৬০ লাখ
'গ' শ্রেণী পৌরসভা (আয় ১০-২৫ লাখ)
রাজা/সার্কেল প্রধান (৩)
পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩)
উপজেলা পরিষদ (৪৪৩)
পৌরসভা - (৩)
ইউনিয়ন পরিষদ (৪২৮২)
উপজেলা পরিষদ (২১)
গ্রাম পরিষদ (৩৮৫৩৮)
ইউনিয়ন পরিষদ (১১৮)
হেডম্যান/কারবারী (৪৭২) ও বাজার চৌং প্রথা
গ্রাম পরিষদ (১০৬২)

উৎস ঃ Kamal Siddiqui (ed) (1994) Local Government in Bangladesh (Revised edition). Dhaka, UPL এবং M.A. Quddus, Tofail Ahmed and M. easin Ali (1995) Integrated Community Development in the Chittagong Hill Tracts, BARD, Comilla. P-5.

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে একটি বিশেষ ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে।

শহরে বা নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা শহরে পৌরসভা আছে। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এ চারটি মহানগরে যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে তা সিটি কর্পোরেশন হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একদিনের ফসল নয়। দীর্ঘদিনের পরিবর্তন, বিবর্তনের রূপ বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এই বিবর্তন ধারাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১। বৃটিশ যুগ (১৮৭০-১৯৪৭)
২। পাকিস্তান যুগ (১৯৪৭-১৯৭১)
৩। বাংলাদেশ যুগ (১৯৭১-২০০৪)

বৃটিশ যুগ (১৮৭০-১৯৪৭) ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান স্থানীয় সরকারের গোড়াপত্তন হয়েছিল বৃটিশ শাসনামলে ১৮৭১ সালে। "চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন" প্রবর্তনের মাধ্যমে। এখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল পাঁচ সদস্যের পঞ্চায়েত গঠনের নিমিত্তে সদস্য নিয়োগের জন্য। এই পঞ্চায়েত ছিল ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন। এই প্রশাসনের কাজ ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায় করা। গ্রামের দেখাশোনা করার জন্য চৌকিদার

নিয়োগের ভারও এই প্রশাসনের উপর ন্যস্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এর নিম্নরূপ অবস্থান লাভ করে ঃ

1. The Bengal Local Self Govt. Act of 1885
2. The Bengal Local Self Govt. (Ammendment) Act of 1908
3. The Bengal Village Self Govt. Act of 1919.

এই সব আইন বলে স্থানীয় পর্যায়ের সরকার কাঠামো নিম্নরূপ অবস্থান লাভ করে ঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামো	স্তর
ইউনিয়ন বোর্ড	ইউনিয়ন পর্যায়
লোকাল বোর্ড	মহকুমা পর্যায়
জেলা বোর্ড	জেলা পর্যায়

বৃটিশ শাসনামলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল। এই সময়ের স্থানীয় সরকারের এককগুলোকে তাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করার অনুমতি দেয়া হত না। এই এককগুলো বৃটিশ সরকারের স্বার্থে কিছু নির্বাহী ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত যা বৃটিশ শাসনের ভিত মজবুত করেছে। বৃটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশে তাদের শাসনকাল দীর্ঘতর করা, যা কেবল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমেই করা সম্ভব। তাই তারা

বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না [সূত্রঃ তোফায়েল আহমদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯]।

পাকিস্তান যুগ (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ

পাকিস্তানী আমলের প্রথমদিকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সুযোগে ১৯৫৮ সালে শুরু হয় আয়ুব খানের সামরিক শাসন। তিনি ক্ষমতাই এসেই এক নতুন ধরনের গণতন্ত্রের ঘোষণা দেন, যার নাম দেয়া হয় "মৌলিক গণতন্ত্র"। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। যথাঃ-

১. বিভাগীয় কাউন্সিল

২. জেলা কাউন্সিল

৩. থানা কাউন্সিল

৪. ইউনিয়ন কাউন্সিল

এই কাঠামোতে ১৮৮৫ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। পল্লী এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে থানা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। পল্লী এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য থানা ও ইউনিয়ন প্ল্যান বুক প্রণয়ন করা হয়েছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিটি থানায় একজন সার্কেল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইউনিয়ন কাউন্সিল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ছিলেন

মহকুমা প্রশাসক। মহকুমা প্রশাসন পদাধিকার বলে ছিলেন থানা কাউন্সিলের সভাপতি। তার ব্যস্ততা বা অনুপস্থিতির কারণে প্রকৃতপক্ষে থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আমলাতন্ত্র কর্তৃক ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের ফলে ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রকৃত অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বাংলাদেশ যুগ (১৯৭১-২০০৪) ঃ

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের রূপরেখা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭ এর ক্ষমতাবলে পাকিস্তান শাসনামলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিলুপ্ত ঘটে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত করা হয়। থানা কাউন্সিলকে বিলুপ্ত করে একটি থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। জাতি গঠন বিভাগের কর্মকর্তার নেতৃত্বে। জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ডেপুটি কমিশনারকে প্রশাসক করে জেলা বোর্ড নামকরণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এর নতুন নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন পরিষদ।

১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের নিম্নরূপ সংস্কার সাধন করা হয় ঃ

স্তর/একক	**নাম**	**প্রধান**
জেলা পর্যায়	জেলা পরিষদ	জেলা প্রশাসক (সরকারী কর্মকর্তা)
থানা পর্যায়	থানা পরিষদ	এস ডি ও (সরকারী কর্মকর্তা)
ইউনিয়ন পর্যায়	ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	
গ্রাম পর্যায়	গ্রাম সরকার	গ্রাম প্রধান (সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসী)

এ অবস্থায় জেলা ও থানা জনপ্রতিনিধিত্ব তুলে দিয়ে আমলাদের অবাধ সুযোগ দেয়া হয়। তাত্ত্বিকভাবে গ্রাম সরকার থাকলেও গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ গ্রামীন এলিটদের হাতে তুলে দেবার একটি রাস্তা সৃষ্টি করা হয়। ফলে স্থানীয় সরকারের এ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি।

১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ১০টি ধাপে ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয় এবং থানা পরিষদ এবং থানা উন্নয়ন কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৯৯১ সালে সামরিক সরকারের পতনের পর নতুন বেসামরিক সরকার স্থানীয় সরকারে গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রেখে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের একটি সুযোগ পেয়েছিল, এই পটভূমিকায় Local Government Review Commission গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে কমিশনের দাখিলকৃত প্রস্তাবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ সকল কর্মকর্তাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা সম্বলিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠনের কথা

ছিল [সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ প্রতিবেদন, মে ১৯৯৭]।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে ক্ষমতাসীন দল স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক করার জন্য জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করেন। অতপর ১৯৯৭ সালে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদ এই চার প্রকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার দ্বিতীয় সংশোধনী আইন ১৯৯৭ এর মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩টি আসনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করার বিধান রাখা হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বশেষ সংশোধন হিসেবে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত 'গ্রাম পরিষদ' বাতিল করে। গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ এ প্রজ্ঞাপিত হওয়ার মাধ্যমে কার্যকারিতা পেয়েছে। গত ২ আগষ্ট ২০০৩ থেকে গ্রাম সরকার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিবর্তন ধারায় এটিই হচ্ছে সর্বশেষ সংস্করণ [সূত্রঃ সিদ্দিকুর রহমান মিঞা, ১৯৯৭]।

ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ ঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নামে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদ হলো এদেশের পরীক্ষিত সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যার নামের কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে সময়ের পরিবর্তন ধারায় দীর্ঘদিনের

চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার কোন বিলোপন বা স্থগিতকরণ ব্যতীতই বর্তমানের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এদেশে জেলা পরিষদ নামক অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি তার বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়েছে, হয়েছে পরিবর্তিত। উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন সফলভাবে যাত্রা করে বড় ধরনের একটি হোঁচট খেয়েছিল। তবে ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার উপরে সরাসরি আক্রমণ করা হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি। বরং এ প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলছে। যাহোক, এদেশের ইউনিয়ন পরিষদ এবং এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার আগে এর বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা থাকা ভাল। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের যে রূপ বা কাঠামো আমরা দেখতে পাই তা দীর্ঘদিনের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে।

এদেশে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার আধুনিক কাঠামোগত ভিত্তির বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পরে। ব্রিটিশরা এদেশে আগমনের পরে ১৭৯০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করে। অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানিক বিকাশের লক্ষ্যে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ করা হয় [সূত্রঃ আনসার আলী খান, এপ্রিল, ২০০৩]।

লর্ড মেয়ো এর আমলে গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০ পাশ হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত গঠনের বিধান এই আইনে রাখা হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠিত হতো। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারদের

বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো। সর্বনিম্ন ট্যাক্সের হার ছিল ছয় আনা। যদি কোন পঞ্চায়েত সদস্য চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতেন তবে তার সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারের বেতন শোধ সহ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হতো।

এ আইনের বলে এদেশে গ্রাম পর্যায়ে সুসংবদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ঠিকই কিন্তু এ ব্যবস্থার বেশকিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত না হওয়ায় তারা একদিকে জনগণের নিকট যেমন গ্রহণযোগ্য ছিলেন না তেমনিভাবে তারা জনকল্যাণের প্রতি ততটা মনোযোগীও ছিলেন না।

(খ) তারা সরাসরি কোন উন্নয়নমূলক কাজও করতে পারতেন না।

(গ) চৌকিদারগণের বেতন প্রায়ই বকেয়া থেকে যেতো।

(ঘ) নিরাপত্তা এবং কর সংগ্রহের নামে জনগণ পঞ্চায়েতের জুলুম ও হয়রানির শিকার হতেন।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-১৮৮৫ অনুসারে ইউনিয়ন কমিটি ঃ

এ আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান রেখে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি চালু হয়েছিল। ২৫.৯০ বর্গকিলোমিটার হতে ৩৮.৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে এই ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। এ কমিটির আওতায় এক বা একাধিক গ্রাম থাকতো। ৫ থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য প্রথম বারের মতো

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্যরা জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। কমিটিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত করা হয়। তাঁদেরকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও কর আদায় ছাড়াও গ্রামের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা এবং লোকাল বোর্ডের প্রত্যার্পিত কিছু বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ আইন পাশ হবার পরে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হলেও চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটিও পাশাপাশি চালু রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন বিকাশের ব্যবস্থা করা হলেও বেশকিছু ত্রুটি ছিল। এ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি হলোঃ

(১) জেলা বোর্ডের হাতে অনেক বেশী ক্ষমতা দেয়ার ফলে ইউনিয়ন কমিটি জেলা বোর্ডের উপর অত্যধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

(২) জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় জেলা বোর্ড নিজস্ব ব্যয় সংকুলান করে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে তেমন সাহায্য প্রদান করতে পারতো না।

(৩) স্বাধীনভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির বিকশিত হওয়ার পথ ছিল না।

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন-১৯১৯ অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড ঃ

এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার কার্যকরী ক্ষমতা ও অধিকতর স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়। এ আইন প্রবর্তনের ফলে ১৮৭০ সালে প্রবর্তিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিন বোর্ড নামে

একীভূত একটি প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল তিন বছর মেয়াদী রাখা হয়েছিল যা ১৯৩৬ সালে বৃদ্ধি করে ৪ বছর মেয়াদী করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ঃ

ক) মোট ৬ হতে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। এ সদস্যদের মধ্য হতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য পদ লাভের বিষয়টি ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়।

খ) ইউনিয়ন বোর্ডের বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়র বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়েছিল।

গ) একুশ বছরের বেশী বয়স সম্পন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষগণই ভোটার হতে পারতেন। সার্কেল অফিসার এর উপস্থিতিতে ভোটারগণ প্রকাশ্যে প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের নাম উচ্চারণ করে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতেন।

ঘ) ইউনিয়ন বোর্ডকে ট্যাক্স আরোপ ও ছোটখাটো ফৌজদারী অভিযোগ নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেয়া হয়। রাস্তাঘাট, পুল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তথ্যাবলী সরবরাহ করা ছিল এ কমিটির প্রধান কাজ।

ঙ) ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের উপরে ন্যস্ত ছিল।

এ আইন বলে প্রবর্তিত বোর্ডের বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হলোঃ-

১) সংরক্ষিত ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা।

২) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি ছিল মূলতঃ মনোনয়ন মূলক।

৩) জেলা পরিষদের উপরে অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা।

৪) স্বকীয় ধারায় স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগের সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমগ্র বিশ্বে যে দ্রুত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তারই ফলশ্রুতিতে বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বৃটিশদের প্রবর্তিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে থাকে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে। ১৯৫৮ সালে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সামরিক শাসকদের মতোই তিনিও শাসন কাঠামোতে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান গঠন প্রক্রিয়ার অন্যতম ফলশ্রুতি হিসেবে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারী হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র- ১৯৫৯ অনুসারে ইউনিয়ন কাউন্সিল ঃ

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারীর ফলে ইউনিয়ন বোর্ড নামক প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন কাউন্সিল করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের

গঠন, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ আদেশবলে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপঃ

১) গড়ে দশ হাজার লোক বসতি সম্পন্ন এলাকা নিয়ে ১০ হতে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন। বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হতেন।

২) এই সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকেই একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

৩) ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানী প্রদানের প্রথা চালু হয়।

৪) ইউনিয়ন কাউন্সিলকে মোট ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর মধ্যে পৌর কার্যাবলী, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার বিষয়ক কার্যাদি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল এর হাতে জাতীয় পুনর্গঠন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যাদি সম্পাদন করণের ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মারফত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতার্পন করা হয়েছিল।

৫) ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠনের জন্য সম্পত্তির উপর কর, চৌকিদারী রেট ও অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এছাড়া

পল্লী, পূর্ত কর্মসূচী এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ করার জন্য সরকার থেকে আর্থিক অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে স্থানীয় আইনের আওতায় স্থানীয় সংস্থাগুলিকে বেশী সুযোগ দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আরো বেশি মাত্রায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করা হয় তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। তবে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বা ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব থাকায় এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ ছিল।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা আনয়নের জন্য কিছু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়ায় এবং জাতীয় সংসদ গঠিত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ৭ জারীর (পিওনং-৭) মাধ্যমে পূর্বের প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে সৃষ্ট সবকয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭৩ ঃ

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়।

প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার আধ্যাদেশ- ১৯৭৬ ঃ

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। যদিও এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অনুরূপ রাখা হয় তবুও এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করা হয়ঃ

১) ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি রহিত করে দেয়া হয়।

২) একজন চেয়ারম্যান ও নয় জন সদস্য সরাসরি ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিক অর্থাৎ ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়।

৩) দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন মনোনীত কৃষক প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয়।

৪) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর মেয়াদী করা হয়।

৫) এ আদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে মোট ৪০টি কাজের ভার দেয়া হয়। আর এ ৪০টি কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ক) পৌর কার্যাবলী, খ) রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী, গ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

এছাড়া ১৯৭৬ সালে জারীকৃত ভিলেজ কোর্ট অর্ডিন্যান্স বলে ইউনিয়ন পরিষদকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তাছাড়া

জাতীয়তা প্রত্যয়ন পত্র, চরিত্রগত প্রত্যয়ন পত্র, আয়ের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান এবং আদমশুমারীর কাজে সহায়তা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ ছিল।

যাহোক এ অধ্যাদেশবলে জারীকৃত বিধিবিধান অনুযায়ী বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলি গঠিত হয়ে উক্ত বিধির আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী এ অধ্যাদেশের অবশ্য কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ- ১৯৮৩ঃ

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অধ্যাদেশটি জারী করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য তিনজন করে মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন মহিলা মনোনীত সদস্য থাকতেন যিনি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হতেন। ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট এক সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের হাতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৯৮৯ সালের ৯ই এপ্রিল পুনরায় এক সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন। এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর ধার্য করা হয়। তবে ১৯৮৭ সালে এক সংশোধনী দ্বারা এর মেয়াদ ৫ বছর করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের হাতে পৌর, রাজস্ব প্রশাসন, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস এ অধ্যাদেশের ২য় তফশীলের বর্ণনা মোতাবেক ২৮টি থেকে কমিয়ে মাত্র

০৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। এগুলি হলোঃ- ১) বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর, ২) গ্রাম্য পুলিশ রেট, ৩) জন্ম বিবাহ এবং ভোজের উপরে ফিস, ৪) জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকায় প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপরে কর, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণমূলক কাজের ফিস। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং জাতীয় সরকারের উপরে নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন- ১৯৯৩ঃ

১৯৯৩ সালের ২২শে জুলাই এ আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর বেশকিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ আইন বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং নয়জন নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়। এ আইন বলে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার করা হয়। এ আইন বলে ১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এর ১৮ ধারার পরিবর্তন করে বলা হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্য (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়া) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে। এ আইন বলে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ শব্দের পরিবর্তে থানা পরিষদ, সাব-ডিভিশনাল অফিসার অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ৫১ নং ধারা এবং প্রথম তফসীলের সংশোধন আনয়ন করে উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ শব্দগুলির পরিবর্তে জেলা প্রশাসক শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে এ আইনের

শেষে দ্বিতীয় তফসীলে ৬টি খাতকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করণঃ- ১) বসতবাড়ীর ইউনিয়ন কর আদায়, ২) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ফেরীওয়ালাদের উপর কর ধার্য করণ, ৩) সিনেমা, নাটক, থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির উপরে কর ধার্য করণ, ৪) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপরে ফি, ৫) ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট হাট বাজার এবং ফেরীর উপর কর ধার্য করণের (উল্লেখযোগ্য যে হাট-বাজার ও ফেরীঘাট এর উপর কর বা ইজারা প্রদত্ত অর্থ) বিষয়টি সরকারের কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে ৬) ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থিত জলমহলগুলির উপর (যা কিনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর) ইজারা প্রদত্ত অর্থ। এ আইন বলে মোট ৭টি ষ্টান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। এ কমিটিগুলো হলো ক) অর্থ এবং সংস্থাপন কমিটি, খ) শিক্ষা কমিটি, গ) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও স্যানিটেশন কমিটি ঘ) অডিট ও হিসাব কমিটি, ঙ) কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম, চ) সমাজকল্যাণ ও কম্যুনিটি সেন্টার এবং ছ) কুটির শিল্প ও সমবায় সংক্রান্ত কমিটি।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন- ১৯৯৭ ঃ

১৯৯৩ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এর ২৩নং বিধি এর সংশোধনী আনয়ন করে এ বিধির সাথে ৩নং উপ-বিধি সংযোজন করা হয়। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন কারণে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তবে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেরূপ সময়সীমা ধার্য করে দিবেন তদানুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হতে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আসবে না। এ সংশোধনী আইন দ্বারা ছোট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনয়ন করা হয়েছিল।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) দ্বিতীয় সংশোধনী আইন- ১৯৯৭ ঃ

এ আইন বলে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৫নং বিধি এর উপ-বিধি (এক) এর পরিবর্তন করে নতুন উপ-বিধি-১ প্রতিস্থাপিত করে বলা হয় যে, একটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠনপ্রণালী ঃ

সর্বশেষ সংশোধনের মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত ইউনিয়ন পরিষদের গঠণপ্রণালী নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(১) ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। এই ১২ জন সদস্য পদের মধ্যে ৩টি পদ শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত।

(২) স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা ১৯৮৩ এর ব্যবস্থাধীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

(৩) প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্যে ৩টি সদস্যপদ সংরক্ষিত। এই সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ৩ ওয়ার্ডের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। উল্লেখ্য, চেয়ারম্যান বা সাধারণ সদস্যদের জন্যে নির্ধারিত ৯টি পদেও নারীরা নির্বাচিত হতে পারেন।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ঐ পরিষদের সদস্য হিসেবেও বিবেচিত হবেন।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে। এই ভাতা বা বেতন কেন্দ্রীয় সরকার যোগান দেবে। তবে অন্যান্য অর্থ সংস্থানের দায়িত্ব স্থানীয় পরিষদের।

(৬) ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ (৯টি পদ) সদস্য পদে নির্বাচনের জন্যে প্রতিটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

(৭) নারীদের সংরক্ষিত ৩টি আসনের জন্যে প্রতিটি ইউনিয়ন ৩টি করে ওয়ার্ডে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রতিটি সংরক্ষিত নারী আসনের সীমানা ৩ ওয়ার্ড মিলিয়ে। এই ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব থানা নির্বাহী অফিসারের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

(৮) ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত।

সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা ১৯৮৩ এবং গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭ ও অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ আইন। ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, জেলা ও দায়রা জজ।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ- ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেনঃ-

ক. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহায়তা করবে;

খ. অপরাধ, বেআইনী তৎপরতা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেবে;

গ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, বন, মৎস্য, পশুপালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক উন্নয়ন স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে;

ঘ. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার ব্যাপ্তি;

ঙ. স্থানীয় সম্পদ এবং এর ব্যবহারের উন্নয়ন;

চ. সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি জনগণের সম্পত্তি রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

ছ. ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন তৎপরতা মূল্যায়ন করা;

জ. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে উপজেলা বা থানা পরিষদের কাছে সুপারিশমালা পাঠানো;

ঝ. জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের তালিকাভূক্তিকরণ;

ঞ. সব ধরনের শুমারী কাজ পরিচালনায় সহায়তা করা।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিকভাবে নাগরিকদের জন্য যেসকল সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১. জনসাধারণের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২. জনসাধারণের জন্যে নির্ধারিত, উন্মুক্ত স্থান, বাগান এবং খেলার ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

৩. সাধারণের পথ-ঘাট এবং নির্ধারিত স্থানগুলোতে আলোর ব্যবস্থা করা।

৪. বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং রাস্তা ও পথ-ঘাটের পাশে, জনসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট করা স্থানে গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৫. শ্মশান, কবরস্থান, সভা-সমাবেশের স্থান এবং অন্যান্য সাধারণের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৬. ভ্রমণকারীদের থাকার ব্যবস্থা করা এবং জায়গার রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. জনসাধারণের পথ-ঘাট জবর দখল প্রতিরোধ করা।

৮. জনসাধারণের চলাচল এবং মিলিত হওয়ার স্থানে উৎপাত বন্ধ ও প্রতিরোধ।

৯. ইউনিয়ন এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. রাস্তা-ঘাট থেকে মলমূত্র ইত্যাদি অপসারণ এবং পরিস্কার করা।

১১. ক্ষতিকর এবং বিপদজনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।

১২. জীবজন্তুর জবাই, বলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ।

১৩. ইউনিয়ন এলাকার ভবনাদি নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ।

১৪. বিপদজনক ভবন, কাঠামো দেখাশোনা।

১৫. কূপ, পানির পাম্প, ট্যাঙ্ক, পুকুর এবং পানি সরবরাহ অন্যান্য ব্যবস্থা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬. দূষণ থেকে পানীয় জলের উৎস রক্ষা ব্যবস্থা।

১৭. জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ অথবা ক্ষতিকর এ রকম কূপ, পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয়ের জল ব্যবহার থেকে জনসাধারণকে বিরত রাখা।

১৮. পানীয় জলের জন্যে রক্ষিত কূপ, পুকুর এবং অন্যা্য জলাধারের কাছে গবাদিপশুর গা ধোয়ানো, স্নান/গোসল এবং কাপড় কাঁচা থেকে জনসাধারণকে বিরত রাখা।

১৯. পুকুর বা অন্যান্য জলাধারের মধ্যে বা কাছে পাট বা পাট জাতীয় গাছ পঁচানো, আঁশ ছাড়ানো থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

২০. আবাসিক এলাকায় চামড়া রং বা টান করা থেকে বিরত রাখা।

২১. আবাসিক এলাকার মধ্যে খনন করে পাথর বা অন্য কিছু আহরণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ।

২২. আবাসিক এলাকায় ইটখোলা, পাত্র ইত্যাদি গড়ার খোলা তৈরি নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করা।

২৩. গবাদি পশু এবং অন্যান্য জীবজন্তু বিক্রি বিষয়ে স্বেচ্ছায় তালিকা প্রস্তুত।

২৪. প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদির আয়োজন।

২৫. জনসাধারণের উৎসবাদি উদ্‌যাপন।

২৬. অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, শিলা-ঝড়, ভূমিকম্প কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণের ব্যবস্থা করা।

২৭. বিধবা, এতিম, দরিদ্র এবং দুস্থ-অসহায় মানুষদের জন্যে ত্রাণ কাজ।

২৮. জনসাধারণের খেলাধুলায় প্রসার।

২৯. শিল্প ও সমাজ উন্নয়নঃ সমবায় আন্দোলন ও প্রসার।

৩০. খাদ্য-শস্যের উৎপাদান বাড়ানোর লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ।

৩১. পরিবেশের সুব্যবস্থাপনা।

৩২. ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩৩. প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৩৪. গ্রন্থাগার, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

৩৫. ইউনিয়ন পরিষদের মতো একই ধরনের কাজ করে এ রকম সংস্থাকে সহায়তা করা।

৩৬. উপজেলা পরিষদের নির্দেশে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করা।

৩৭. ইউনিয়নের বাসিন্দা অথবা সফরকারীদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ বা সুবিধার্থে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তনতা তথা সিদ্ধান্তহীনতা থেকেই "নারীর ক্ষমতায়ন" বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্যই নয় বরং নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। নারীর সবল ও সচেতন অস্তিত্বের বিকাশ ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য। নারীর মনোজগতের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ নারীর ক্ষমতাকে করেছে অধীনস্ত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নারী পুরুষের সাম্য, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীবাদের উদ্ভব ঘটে। বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে পুরুষের মত নারীরাও সমান অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক নারীবাদের ধারা শক্তিশালীরূপ ধারণ করে। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত অধিকার, ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে পুরুষের সমান অধিকার উদারনৈতিক নারীবাদের মূল দাবী হয়ে উঠে। নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক পর্যায়ের সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে

অগ্রাধিকার দেয় হয়। রিওয়ে ধরিত্রী সম্মেলন, ভিয়েনার মানবাধিকার সম্মেলন, কায়রোতে জনসংখ্যা সম্মেলন, কোপেন হেগেনে সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন এবং বেইজিং নারী সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। কেবল বিশ্ব সম্মেলন নয় বাংলাদেশেও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পরিসরে যে কোন নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে পিতৃতন্ত্র ও সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

নারীর ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্য পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নারীর অধস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ এবং রূপান্তর করা। কাঠামো ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে জোরদার করে তা পরিবর্তন করা যেমন পরিবার, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, প্রথা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, আইন এবং ওপর-নীচ উন্নয়ন মডেল ইত্যাদিসহ সবকিছু রূপান্তর করা।

এছাড়া বস্তুগত সম্পদ এবং জ্ঞান সম্পদের উপর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ । নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষকেও ক্ষমতায়ন করবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষের বিরুদ্ধে নয় । পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সকল প্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষকেও মুক্ত করবে। তারা নির্যাতক এবং শোষনকারীর ভূমিকা থেকে মুক্তি পাবে। এতে করে পুরুষরাও

গৃহকাজ এবং শিশুপালনে অংশ নেবে । বিনিময়ে নারীরাও পুরুষের কাঁধে চাপানো সনাতন দায়িত্ব পালনে অংশ নেবে ।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

নারী নেতৃত্বের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ও রাষ্ট্রক্ষমতাবিহীন নির্বিশেষে রাজনৈতিক নারী ব্যক্তিত্বগনের অনেকেই নারীত্বের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছেন বা তারা স্বয়ং ব্যবহার কতে না চাইলেও তাদের নারীত্ব রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে [সূত্রঃ নূর হোসেন মজিদী, মে- ১৯৯৯]।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণাটি অতি সম্প্রতিকালের। নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনগুলি লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনগুলো সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধিতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Cleen ক্ষমতার দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিষয়ে ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবী আদায় এবং উচ্চ মজুরী বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবী জানানোর সামর্থকে "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোন থেকে। সচেতনতা নারীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বিষয়টি

যথার্থ হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস ঃ

স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে নারীদের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ দেয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতে নিম্নবর্ণের পুরুষদের মতো নারীদেরও (যে কোন বর্ণের) অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। কাঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা রাজনীতিতে ছিলেন অস্পৃশ্যদের মতো। টিংকার, টেপার, আহম্মেদ সিদ্দিকী প্রমুখের গবেষণায় দেখা যায়, ভারতে স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠোমোর ভিত্তিমূল রচিত হয় ১৮৭০ সালে প্রণীত গ্রাম চৌকিদারী এ্যাক্টের মাধ্যমে। গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৩ থেকে ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো গ্রাম পঞ্চায়েত, সদস্যদের সকলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। পঞ্চায়েতের উপর জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব না থাকা এবং সদস্য নিয়োগ গণতান্ত্রিক না হওয়ার কারণে ১৯৮২ সালে লর্ড রিপনের রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত 'বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট ১৮৮৫' এ তিন স্তর বিশিষ্ট যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় তার সর্বনিম্ন স্তর ছিল ইউনিয়ন কমিটি। ইউনিয়ন কমিটির ৫ থেকে ৯ জন সদস্য ইউনিয়নে বসবাসকারী পুরুষের মধ্যে যাদের বয়স ২১ বৎসরের উর্দ্ধে, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদানকারী এবং শিক্ষিত কেবলমাত্র তারা তাদের

মধ্য থেকে ভোটে নির্বাচিত হতেন। লর্ড রিপন তাঁর রেজুলেশনে স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক স্তরে সদস্য নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের এ্যাক্ট বলে প্রণীত ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন কমিটি বিশেষ করে লিভেঞ্জ কমিটির রিপোর্টেও স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ১৯৪৪ সালে রোলান্ড কমিটির রিপোর্টে ইউনিয়ন বোর্ডকে আরো গণতান্ত্রিক রূপ দেয়ার সুপারিশ করলেও মহিলাদের ভোটাধিকারের সুপারিশ করা হয়নি। নারীরা নিম্নবর্ণের মানুষের মতো রাজনৈতিক অধিকারহীন ছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসমূহ স্থানীয় সরকার কাঠামোয় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন কিন্তু নারীদের ভোটাধিকার প্রদান কিংবা স্থানীয় সরকার কাঠামোয় তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখার কোনো দাবি জানাননি। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে যখন স্যার সুরেন্দ্র মোহন ব্যানার্জী সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী হলেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেও নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলেছেন বলে জানা যায়নি। ভারতীয়রা রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা চেয়েছে কিন্তু নারীদের বাদ রেখে, যা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

বৃটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক সরকারের জারিকৃত এক অধ্যাদেশে ১৯১৯ সালের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা হয়। এতে সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন প্রথা বাতিল, ইউনিয়নের জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সদস্য

নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো স্থানীয় সরকার সংস্থায় মহিলাদের ভোটদানের অধিকার প্রদান। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করায় মহিলারা ভোট প্রদান করতে সমর্থ হন। অবশ্য মহিলাদের ভোটাধিকা প্রদান নারী অধিকার প্রদান বা পিতৃতন্ত্রের নমনীয়তার পরিচায়ক নয়। মুসলিম লীগ একদিকে নিজেদের ভোট বাড়ানোর জন্য যেমন মহিলাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে গেছে আবার অন্যদিকে নারীর অবরোধকে যুক্তিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক উল্লিখিত ২ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হতেন। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে জারিকৃত 'ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩' বলে মনোনীত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা ২ জন থেকে ৩ জন বৃদ্ধি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন মহিলা সদস্য নিজ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হতেন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩' সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। মনোনয়ন প্রথায় মহিলা সদস্যরা নিজস্ব যোগ্যতার পরিবর্তে চেয়ারম্যান মেম্বারদের সাথে আত্মীয়তা, পরিবার, বংশের প্রভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোনীত হতেন। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৯২৭ জন সদস্যদের উপর পরিচালিত ১৯৯৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ৪০% সদস্য চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা, ৪৮% আত্মীয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চেষ্টা বা

যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য নির্ধারক বিশেষত পুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ্য ভূমিকা পালন করতো, ফলে মনোনীত সদস্যরা পরিষদের সভায় আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেতেন না। এমনকি পরিষদের সভায় উপস্থিতও থাকতেন না। সাধারণত মহিলা সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকলেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন না। পুরুষ সদস্যের সিদ্ধান্তেই তারা সায় দিতেন। এর ফলে দেখা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে নিজস্ব স্বার্থে সিদ্ধান্তগ্রহণ কিংবা তার সুফল ভোগ করার সুযোগ মহিলা সদস্যরা পেতেন না। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার কারণে পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন করতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জাগ্রত হতে থাকে।

আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন নারী সংগঠন, গবেষক, এনজিও এবং সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি জানানো হতে থাকে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এর পেছনে দাতা গোষ্ঠীসহ আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিষয়টি সম্পৃক্ত। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল থেকে নারীবর্ষ ও ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজি প্রবাহে নারী উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য প্রদানে নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি

গ্রহণের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কল্পিত ব্যাপার নয়। বাংলাদেশে ৮০'র দশকে এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নারী বিষয়ক কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এর পেছনেও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে উন্নয়ন চিন্তায় নারীর অন্তর্ভূক্তি নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। কারণ, এনজিওগুলো যে তহবিলের যোগান পায় সেখানে নারী বিষয়ক কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার রিপোর্টে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার সুপারিশ করা হয়। এসব প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এ্যাক্টে ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ৩ ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে ৩ জন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ৩টি ওয়ার্ডের নারী ও পুরুষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এ্যাক্টের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে এবং ১২.৮২৮ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচন পূর্বের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে এবারই প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এ কারণে গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনে ভোট প্রদান করা কিংবা নির্বাচিত হয়ে আসাটাই নারীর চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সার্বিক শর্ত পূরণ করে না। নির্বাচিত হয়ে

আসার পর কার্যকরভাবে পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কিংবা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইঙ্গিতবাহী।

ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসাবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ।

নির্বাচনের বছর	**ইউনিয়নের সংখ্যা**	**মহিলা প্রার্থী**	**নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান**
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ (২% প্রায়)

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ইউ.এন.ডি.পি রিপোর্টি অন হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ - ১৯৯৪।

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারীদের অংশগ্রহণ ঃ

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ষষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে, মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে এবারই প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনকালীন অবস্থায় বাংলাদেশে ৪৪৬৮টি ইউনিয়ন ছিল। গ্রামীন সমাজে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ কোটি । প্রতি ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ১১ হাজার ভোটার এবং প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে ভোটার ছিল ১২৫০ জন। এই নির্বাচনে ডিসেম্বর ১৯৯৭ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ২৯মে ১৯৯৮তে মেয়াদ উত্তীর্ণ মোট ৪৩৩০টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মোট ৪২৯৮টি ইউনিয়নে ডিসেম্বরে একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন উন্নয়ন পদক্ষেপ এপ্রিল-জুন ৯৯ সংখ্যার “স্থানীয় সরকারে নারী তৃনমূলে জাগরণ” শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ২ লাখ ১০ হাজার ৩ শত ৩৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৪২৯৮টি ইউনিয়নের ১২ হাজার ৮শ ৯৪টি সংরক্ষিত নারী আসনে ৪৪ হাজার ১শ ৩৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দিতা করেন [সূত্রঃ মানব জমিন, ২২ জুন ১৯৯৯]। এদের মধ্যে সারাদেশে ৫৯২ জন নারী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এছাড়া সারাদেশে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান ও সাধারণ সদস্য আসনে ১১০ জন নির্বাচিত হয়েছেন । ১২৮২৮ জন নারী সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন [সূত্র ঃ ক্ষমতায়নে নারী পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি]। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ

সংশোধিত রূপলাভের মধ্য দিয়েই প্রত্যেক এলাকার গ্রাম গঞ্জ গুলোতে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করে। সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটে এলাকার নারীদের মধ্যে । যারা সবসময় দেখে আসছে তাদের বাবা, ভাই, স্বামী শ্বশুর বা এলাকার পুরুষদের চেয়ারম্যান বা ইউপি সদস্য হতে । সেই তারাই স্বপ্ন দেখা শুরু করে ইউপি নারী সদস্য হওয়ার। এ পর্যায়ে একেবারে সাধারণ হতদরিদ্র পরিবারের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত গৃহবধু থেকে শুরু করে শিক্ষিত তরুণী, বয়স্ক এনজিও কর্মী এবং শিক্ষিকা সকলেই অংশগ্রহণ করে।

সারাদেশে দেখা গেছে যারা নির্বাচন কী বোঝেন না তারাও মাঠে নেমেছেন । দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ভোট চেয়েছেন আর দিয়েছেন নানা প্রতিশ্রুতি। দেশের জনগনের তথা নিজ এলাকার উন্নয়নে কাজ করার উদ্দেশ্যে বাড়ির সাধারণ নারী পুরুষদের পাশাপাশি নির্বাচন করেন । বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে নারী ভোটারদের মধ্যেও। প্রথমবারের মত বিপুল সংখ্যক নারীর নির্বাচনে অংশ নেয়ার কারণে নারী ভোটার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় আশাতীত ভাবে। "দৈনিক মানব জমিন, ২২ জুন, ১৯৯৯" প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে এ নির্বাচনে শতকরা ৮৫ ভাগ নারী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ।

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যর দায়িত্ব ঃ

ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিসমূহে পুরুষ বা মহিলা সদস্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া নেই। পরিষদের সকল নির্বাহীর ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত। তিনি নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন। ইউনিয়ন

পরিষদ ম্যানুয়ালে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের উল্লেখ না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রবল থাকায় মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব বা ক্ষমতার আওতাধীন কোনো কাজ আছে বলে অনেক চেয়ারম্যান মনে করেন না। নারী সদস্যদের কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বা কর্তব্য না থাকায় তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা, ক্ষোভ বিরাজ করছে। টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত একজন মহিলা সদস্য ক্ষোভের সাথে বলেছেন, "আমি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।" একই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে কুষ্টিয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মহিলা সদস্যদের মধ্যে। তারা নিয়মিত পরিষদের কার্যালয়ে যান, তবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না থাকায় গল্প-গুজব করে চলে আসেন। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাদের সাথে পরিষদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনা করার আগ্রহ দেখান না।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেবার ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক জটিলতা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা জনপ্রতি তিনটি ওয়ার্ডের ভোটে জয়ী হয়েছে, সেখানে পুরুষ সদস্যদের ১টি ওয়ার্ড, স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের অবস্থান, কাজকর্ম কিছুটা ভিন্ন হবে। কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে বা কতটুকু সম্পৃক্ত করা হবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। জাতীয় মহিলা সংস্থা আয়োজিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ দায়িত্ব ও কার্যাবলী সংক্রান্ত সমস্যার কথা

তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্যে বলা হয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছাড়া নির্বাচিত হয়ে আসাটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তারা পরিষদে তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ ও ক্ষমতা প্রদানের দাবি করেন। মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত নারী সদস্যদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ১২টি বিষয়ে দায়িত্ব দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১২টি বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা ৩টি ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোতে জন্ম-মৃত্যুর উপর পরিসংখ্যান সংগ্রহ, শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মৎস্য ও হাঁস-মুরগী পালন, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পুরুষ আধিপত্যাধীন ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের এসব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন অনেকাংশে নির্ভর করে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের আচরণ ও সহযোগিতার ওপর।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদেরকে যেসকল দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তর করার বিধান রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির তিনটিতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে আটটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা।
- যে সব নারী সদস্য প্রকল্প কমিটির সভাপতি হতে পারেন না তারা প্রকল্প কমিটির সদস্য হবেন।

- নলকূপ স্থাপনের স্থান নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটির সদস্য হবেন।

- গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ওয়ার্ড কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যকে সহ সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হবে।

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাভূক্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির এক-তৃতীয়াংশের সভাপতি হিসেবে-ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের নির্বাচিত করার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

- পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মনিটরিং ব্যবস্থায় বর্তমানে নিয়োজিত তিনজন মনিটরের মধ্যে একজন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যকে মনিটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

- যে তিনটি ওয়ার্ড থেকে নারী সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন সেই তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গ্রাম সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি হবেন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য।

- ইউনিয়ন ভিজিডি নারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের ৩ (তিন) টি ওয়ার্ডের জন্যে নির্বাচিত (সংরক্ষিত আসনে) নারী সদস্যরা তাঁর এলাকার অর্থাৎ ৩ (তিন) টি ওয়ার্ডের ৫০% উপকারভোগীর তালিকা প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করবেন। অবশিষ্ট

৫০% নারী প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে প্রণয়নের দায়িত্ব হবে সাধারণ ৯ (নয়) টি আসনের সদস্যদের।

ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা ঃ

ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার মাধ্যম হলো পরিষদের সভা, প্রকল্প কমিটি ও কমিটি ব্যবস্থা। প্রতি মাসে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল সদস্য নিয়ে মাসিক সভা করার বিধান রয়েছে। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সদস্যদের মধ্য থেকে ১ জনের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সভায় বাজেট প্রণয়ন, দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই পরিষদ কার্যালয় থেকে সভার তারিখ ও আলোচ্যসূচি সদস্যদের অবহিত করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন আকারে লিখে সভায় উপস্থিত সদস্য ও চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবরে পরিষদের সচিব পাঠিয়ে দেন।

বিধান অনুযায়ী প্রতি মাসে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠিত না হলেও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের নির্দেশে পরিষদের সচিব তাদের ঠিক করে দেয়া সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন আকারে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেন। বিভিন্ন নারী সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে না লিখে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের মনগড়া সিদ্ধান্ত লেখা হয়। এক্ষেত্রে নারী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রায়ই বাদ দেয়া হয় অথবা পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া

হয়। কুষ্টিয়া অঞ্চলের মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ জন মহিলা সদস্য (যাদের মধ্যে ১ জন ইতিপূর্বে মনোনীত সদস্য ছিলেন) জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কেবলমাত্র স্বাক্ষর দিতে বলেন। স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেও সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাদের স্বাক্ষর নকল করে দিয়ে দেয়া হয়। মাসিক সভায় মহিলা সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে মহিলা সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। নেত্রকোনা জেলার গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা মেনে নিতে পারেননি। পরিষদের চেয়ারম্যান মাসিক সভাসহ প্রত্যেকটি কাজ প্রভাবশালী পুরুষ মেম্বারদের নিয়ে সমাধা করেন বলে জানা গেছে।

মহিলা সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না থাকার কারণে পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরাই যাবতীয় সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। সভায় মহিলা সদস্যদের মতামত প্রদানের সুযোগও সেজন্য সীমিত। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ, বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টনে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচেছন। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মহিলারা নির্বাচন করে পরিষদে অংশগ্রহণ করেছেন তা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষদের আধিক্য ও পুরুষ সদস্যদের মতো নারী সদস্যদের পরিষদের কর্মকাণ্ডে দক্ষ না হওয়ার কারণে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারেন না।

পরিষদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব না পাওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ না থাকায় মহিলা সদস্যরা তাদের ভোটারদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। অনেকের বাড়ি থেকে বলে দেয়া হয়েছে সরকার দায়িত্ব দেবার পর তারা যেন পরিষদের কাজে যান, তার আগে নয়। মহিলা সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন তারা জনগণের কাছে কি করে মুখ দেখবেন? ভোটের আগে নারী প্রার্থীরা নারীদের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার আগ্রহও রয়েছে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কারণে এ ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যা নারী সদস্যদের প্রতিশ্রুতি পালনে এবং দায়িত্ব পালনকালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

নির্বাচিত নারী সদস্যদের বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পল্লী গাঁয়ের নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনসহ অন্যান্য আসনে ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। তাদের কাজ, দায়িত্ব পালনে নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু প্রতিবেদন এটাই প্রমাণ করে যে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই সব নারী প্রতিনিধিরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিন থেকে শুরু করে হত্যার হুমকি, ধর্ষণ, অপহরণ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ, সহকর্মীদের অসহযোগিতা, অবজ্ঞা, অশালীন আচরণের শিকার হচ্ছেন। "দৈনিক প্রথম আলো", ২৫ জুন ১৯৯৯ এবং "দৈনিক সংবাদ" ২৬ জুন ১৯৯৯ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হাতে গোপালগঞ্জের এক ইউপি নারী সদস্য লাঞ্ছিত হয়েছেন। দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে তাকে রাস্তায় মারধর এবং বিবস্ত্র করা

হয়। ১০ জুন '৯৯ প্রথম আলো-তে প্রকাশিত হয় পুরুষ সদস্যর অশালীন আচরণের প্রতিবাদ ও বিচার দাবি করায় ইউপি চেয়ারম্যান উল্টো নারী সদস্যর আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর প্রতিবাদে উক্ত নারী সদস্য ইস্তফা দেয়ার ও আত্মহত্যার হুমকি দেন। একই পত্রিকায় ২৪ জুন '৯৯ প্রকাশিত অপর এক প্রতিবেদনে ছাপা হয়েছে মিটিং, সালিশ এ নারী সদস্যদের ডাকা হয়না, এমনকি সরকারি কোনো চিঠিপত্রও দেখানো হয় না। শুধুমাত্র সই লাগলে চেয়ারম্যান কাগজ বাসায় পাঠিয়ে দেন নয়তো জোর করে সই করিয়ে নেন। ভোরের কাগজে ১৩ মে '৯৯ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে সুনামগঞ্জ এর একটি ইউনিয়নের নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও শপথ নিতে পারেননি পারিবারিক জটিলতার কারণে। মূল ঘটনা সবাই জানলেও তাকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। ২১ মার্চ '৯৯ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে যে, এক পুরুষ সদস্য একটি মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করায় ফলস্বরূপ একটি সন্তান জন্ম দেয়। একই ইউনিয়নের নারী সদস্য মেয়েটিকে আশ্রয় দেয়ায় তাকে নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট এ ৬ মার্চ শ্রীমঙ্গলের এক ইউপি সদস্যকে অপহরণ ও ধর্ষণ করার খবর এসেছে। সংবাদে ২২ মার্চ '৯৯ প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ভিজিএফ এর চাল বিতরণের নাম করে বেগমগঞ্জের এক চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নের এক নারী সদস্যকে ডেকে এনে ধর্ষণ করে। জনকণ্ঠে ১৭ মে '৯৯ সারাদেশে ৪ জন ইউপি নারী সদস্যকে ধর্ষণ করার খবর প্রকাশিত হয়েছে। ৭ মে '৯৯ জনকণ্ঠ ও ১০ মে '৯৯ প্রথম আলো-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসেছে কিশোরগঞ্জের এক ইউপি সদস্যর কথা। এক সন্ত্রাসীর চারিত্রিক প্রত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর না করায় ঐ সন্ত্রাসী ইউপি সদস্যর বাড়িতে ঢুকে মেয়ের সামনে তাকে ধর্ষণ করে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ইউপি নারী সদস্যদের সাথে ঘটছে।

এ দৃশ্যের পাশাপাশি এটাও প্রকটভাবে শোনা যাচ্ছে যে, নির্বাচিত এই নারী সদস্যরা তাদের কাজ/দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। তারা কাজ বোঝেন না, ঠিকমতো সভা/সালিশে বা ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন না। তাদের অধিকাংশ কাজ করেন তাদের স্বামী/ভাইরা। এমনকি কোনো কোনো ইউপি নারী সদস্যর স্বামী সভায় উপস্থিতি খাতাতেও নিজে স্বাক্ষর করেন। মানবজমিনের ২২ জুন '৯৯ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বরগুনা জেলার বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যকে কাজের প্রয়োজনেও পাওয়া কষ্টকর। নির্বাচিত নারী সদস্যদের স্থলে স্বামীরা সভায় যাচ্ছেন আর সদস্য আগের মতোই সাংসারিক কাজ করছেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নারী সদস্যদের কাজের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই গিয়ে পড়েছে পরিবারের প্রভাবশালী পুরুষ সদস্যর ওপর। এবং যেহেতু তাদের পরিবারের একজন নারী ইউপি সদস্য এবং পুরুষ হিসেবে তাকে সাহায্য করার দায়িত্বও তার। তাই এরা নিজেদের নির্বাচিত ইউপি সদস্যই মনে করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। বিশেষ করে তাদেরকে ধর্ষণের মতো জঘণ্য ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে। এইসব ঘটনার অপরাধী ও নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবী জানিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার ও নারী সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। ইউপি সদস্যদের নির্যাতনকারীদের অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল, ১৯৯৮ সম্পর্কে নারী সমাজকে অবহিত করার দাবিতে ১ জুলাই ১৯৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মিলিত নারী সমাজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। এতে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনানো হয়। ধর্ষণসহ অন্যান্যভাবে নির্যাতিত ইউপি নারী সদস্যদের নির্যাতনকারীদের সুষ্ঠু বিচার দাবি করা হয়। [সূত্রঃ পাক্ষিক চিন্তা, ১৫ জুলাই, '৯৯] এতে আরো বলা হয় নারী

সদস্যরা তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ পাচ্ছেন না বলে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন। সরকার প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের এ কাজে যুক্ত করলেও তাদের জন্যে কাজের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এছাড়াও তাদের কাছে সঠিক দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিষয়টিও পরিস্কার না। এসবই সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা এলাকার পরিচিতি ঃ

ফরিদপুর জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এই জেলার অন্তর্ভূক্ত ফরিদপুর সদর উপজেলা আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র। এর আয়তন ৩৯৬ বর্গকিমি। উত্তরে গোয়ালন্দঘাট ও হরিরামপুর উপজেলা, দক্ষিণে নগরকান্দা উপজেলা, পূর্বে চরভদ্রাসন ও হরিরামপুর উপজেলা, পশ্চিমে বোয়ালমারী, মধুখালী ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা।

ফরিদপুর থানা সৃষ্টি ১৮৯৬ সালে। বর্তমানে এটি ফরিদপুর সদর উপজেলা। এই উপজেলা মোট ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। সেগুলো হলোঃ

১. ঈশানগোপালপুর,
২. কৈজুরী,
৩. নর্থচ্যানেল,
৪. আলিয়াবাদ,
৫. গেরদা,
৬. চরমাধবদিয়া,
৭. কানাইপুর,
৮. মাচ্চর,
৯. অম্বিকাপুর,
১০. কৃষ্ণনগর ও
১১. ডিক্রিরচর

এই ১১টি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমার গবেষণাকার্য সম্পাদন করা হয়। অত্র এলাকার মোট জনসংখ্যা ৩৩৫৩৮৬ জন; তারমধ্যে পুরুষ ৫১.৯% ও মহিলা ৪৮.১%। এই উপজেলার শিক্ষার হার ৬৬.৬%। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ২৯.৪৭%, মৎস্য ১.০৮%, কৃষি শ্রমিক ১৭.১৩%, অকৃষি শ্রমিক ৪.১৬%, ব্যবসা ১৫.৭৪%, পরিবহণ ৫.৭%, নির্মাণ ২.০৩% চাকরি ১২.৮%, অন্যান্য ১১.৮৯%। যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকা রাস্তা ১১০ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৫১৫ কিমি, আধাপাকা রাস্তা ৭০ কিমি, রেলপথ ২৫ কিমি, বাঁধ ২১ কিমি। কয়েকটি শিল্প কারখানাসহ বেশ কিছু কুটিরশিল্প রয়েছে এ এলাকায়।

অত্র এলাকার জনসাধারণের প্রধান পেশা কৃষি কাজ হলেও কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং অলাভজনক বিষয়ে পরিণত হওয়ায় ধীরে ধীরে লোকজন ছোটখাট ব্যবসা ও শ্রমিক শ্রেণীর কাজ যেমনঃ ইটের ভাটায় কাজ করা, রাজমিস্ত্রীর কাজ করা, রিক্সা চালানো ও মাটিকাটা ইত্যাদি পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এলাকায় বেশীর ভাগ লোক নিম্নবিত্ত এবং এসব পরিবারে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, আর কয়েকজন থাকলেও তা স্কুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু পরিবারের ছেলেমেয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে এসে চাকুরী জীবনে সম্মানজনক স্থান দখল করেছে, যাদের সবাই শহরে বসবাস করে। উল্লেখ্য স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হচ্ছে। তবে আমার কাছে যা মনে হয়েছে এই এলাকার সকল শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন এবং এলাকার প্রভাব বিস্তার নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল বিদ্যমান রয়েছে। আইন-শৃংখলা বিঘ্ন করে এমন সব বিষয়ে অপরাধ প্রবণতা অনেক কম। পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি

পালনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন তথা প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা বিদ্যমান রয়েছে। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে তবে কোনরকম ধর্মীয় গোড়ামি এলাকাবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি কখনও তারা নেতিবাচকভাবে দেখেনি বরং নির্বাচনের সময় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মহিলা সদস্যদের নির্বাচনী প্রচারণায় সহযোগিতা করেছে। এলাকার প্রধান কয়েকটি রাস্তা পাকা হওয়াতে চলাফেরা এবং শহরের সাথে যোগাযোগ খুব সহজ হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় সহজ সরল মানুষের মাঝে নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে বেঁচে থাকার জন্য এলাকার অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

ফরিদপুর সদর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ১১টি ইউনিয়নের ৩৩ জন নারী সদস্যদের কার্যক্রমের উপর আমার গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করা হয়। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উল্লেখিত নারী সদস্যদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা থাকা অত্যন্ত জরুরী বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা তাদের কার্য সম্পাদন করছে সে বিষয়ে অবগত না হলে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা দুরুহ ব্যাপার। তাই গবেষণায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখানে ব্যক্তিভিত্তিক তুলে ধরা হয়েছে।

আলিয়া মাহমুদা আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠে সেটা হচ্ছে তিনি নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে একটি এন.জি.ও-তে চাকুরী করেন। তার স্বামী কৃষিকাজ করেন। তিনি ১ ছেলে

এবং ১ মেয়ের জননী। সন্তানদের ভালভাবে লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেশ সচেতন। সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বেশ দৃঢ়তা লক্ষ্য করা গেছে। ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সামাজিক সম্মান আগের তুলনায় বেড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য হলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। নিজে দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে একটা এন.জি.ও- তে পুষ্টি প্রকল্পের কাজ করেন। স্বামীর কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা আয় হয়। দুই ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে তারা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে তিনি কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন না। ফিরোজা খানম আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। ১০০০ টাকা মাসিক বেতনে পুষ্টি প্রকল্পে চাকুরী করেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বামীর মাসিক আয় ২০০০ টাকা। তিনি তিন ছেলে এবং এক মেয়ের জননী। অর্থনৈতিকভাবে টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতে হয়। তার মতে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় তার পরিচিতি বেড়েছে এবং নিজে এজন্য সম্মান বোধ করেন।

ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মোছাঃ মালেকা বেগম। স্বামীর কৃষিকাজ সহ নিজের হাঁস-মুরগী পালন ও সবজী চাষ ইত্যাদি থেকে সংসারে মাসে ৬ হাজার টাকা আয়। তার চার ছেলে ও দুই মেয়ে। পারিবারিক ও সামাজিক দিক দিয়ে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় কাজকর্মে উৎসাহ পাচ্ছেন। মোছাঃ হেনা বেগম ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য। তার স্বামীর নাম মনিরুজ্জামান মিঞা

মঞ্জু। গবেষণাকালীন সময়ে তার অনুপস্থিতির কারণে তার সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। মোছাঃ পাপিয়া বেগম ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তার চাকুরীজীবি স্বামীর মাসিক আয় ৫ হাজার টাকা। তিনি দুই মেয়ে সন্তান সহ সংসার নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দেই আছেন বলে জানিয়েছেন। ইউপি সদস্য হিসেবে তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যথেষ্ট সহযোগিতা পান।

অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য রাশিদা বেগম। তার স্বামী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে মাসে ৮ হাজার টাকা আয় করে। রাশিদা বেগমের এক ছেলে এবং এক মেয়ে। হালিমা বেগম অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য। হাঁস-মুরগী পালন ও সব্জী চাষের মাধ্যমে তার মাসিক আয় ১ হাজার টাকা। কৃষিকাজের মাধ্যমে সংসারের অন্যান্য সদস্যদের মাসিক আয় ২ হাজার টাকা। সামাজিকভাবে এলাকায় হালিমা বেগমের পরিবারের প্রভাব বিদ্যমান থাকায় তাকে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছেন। মোছাম্মদ মরিয়ম বেগম অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। পেশায় তিনি মহিলা দর্জি হিসাবে মাসে ৮ হাজার টাকা আয় করেন। সংসারের অন্যান্য আয়ের উৎস হিসাবে স্বামী ও পুত্র সন্তানের ব্যবসার মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ৯ হাজার টাকা আয় হয়। অর্থনৈতিকভাবে এ পরিবার বেশ স্বচ্ছল এবং বেশ উৎসাহ সহকারে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মোছাঃ মমতাজ বেগম। তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পেশায় গৃহিনী এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ের জননী। কৃষিকাজ এবং স্বামীর ব্যবসা সূত্রে সংসারের মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা। মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার

ব্যাপারে পারিবারিক ও সামাজিক পরিচিতি বিশেষভাবে কাজ করেছে। মোছাঃ আছমা বেগম চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি এস.এস.সি পাশ এবং স্থানীয় একটি লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ান এর চাকুরী করেন। তার মাসিক আয় ৪ হাজার টাকা। এছাড়া স্বামী এবং দেবরের ব্যবসা সূত্রে আয় মাসিক ৮ হাজার টাকা। তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী এবং তার নির্বাচনের ব্যাপারে এলাকায় পরিবারটির প্রভাব বিশেষভাবে সহায়তা করেছে এবং এ ব্যাপারে তার স্বামীর সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন। মোসাঃ জয়গুন খাতুন চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, কেবল স্বাক্ষর করতে পারেন বলে জানিয়েছেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী। কৃষি খামার ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে সংসারের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা। নির্বাচনের ব্যাপারে তার পরিবারের তেমন সহযোগিতা পাননি। মূলতঃ তিনি নিজের একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবী করেন। নির্বাচিত হওয়ায় তার সামাজিক সম্মান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি আনন্দিত।

মাচ্চর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মোছাঃ সাজেদা বেগম। তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তার দুই জন মেয়ে সন্তান রয়েছে। সমিতি ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে তার মাসিক আয় ২৫০০ টাকা। স্বামীর কৃষিকাজ থেকে মাসিক আয় ৫ হাজার টাকা। মেয়ে সন্তানদের সমাজে সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ সচেতন। মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় তিনি নিজে গর্বিত বোধ করেন। রোকেয়া বেগম মাচ্চর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি বিএ পাশ, পেশায় গৃহিনী। স্বামীর চাকুরী সূত্রে বার্ষিক আয় ৬০ হাজার

টাকা। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী। পরিবারটির সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিচিতি তাকে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে। শেফালী আক্তার মাচ্চর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি বিএ পাশ। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং এক ছেলের জননী। ব্যবসা সূত্রে স্বামীর বাৎসরিক আয় ৬০ হাজার টাকা। এছাড়া পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত কৃষি জমি হতেও বৎসরে কিছু আয় হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা বেশ স্বচ্ছল এবং পরিবারটির সামাজিক পরিচিতি তার নির্বাচিত হওয়ার প্রধান কারণ।

মোসাঃ আকলিমা বেগম কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি। এন.জি.ও-তে চাকুরীর মাধ্যমে তার নিজের মাসিক আয় ৮০০ টাকা। স্বামীর চাকুরী সূত্রে মাসিক আয় ১ হাজার টাকা। তিনি এক মেয়ের জননী। স্বামী এবং স্থানীয় লোকজনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ফেরদৌসী সুলতানা একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি এবং পেশায় শিক্ষিকা। মাসিক আয় ১ হাজার টাকা। কৃষিকাজ হতে স্বামীর মাসিক আয় ২ হাজার টাকা। তিনি এক মেয়ের জননী। কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য নাছিমা জাফর নবম শ্রেণী পাস। পেশা হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা করেন বলে জানিয়েছেন। স্বামীর ব্যবসা সূত্রে মাসিক আয় ১২ হাজার টাকা। তিনি চার কন্যা সন্তানের জননী। তার স্বামীর সামাজিক প্রভাব তাকে নির্বাচিত হতে প্রভাবিত করেছে।

ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য আজেদা বেগম। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জননীয়। তার শিক্ষাগত

যোগ্যতা এস.এস.সি। সমিতি ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে তার নিজস্ব আয় মাসে ১৫০০ টাকা। চাকুরী সূত্রে স্বামীর মাসিক আয় ৪ হাজার টাকা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা মোটামুটি স্বচ্ছল বলে জানিয়েছেন। সমাজে পারিবারিক প্রভাব তার নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একই ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য জোসনা বেগম ৫ম শ্রেণী পাস। তিনি চার কন্যা সন্তানের জননী এবং পেশায় গৃহিনী। স্বামীর চাকুরী সূত্রে মাসিক আয় ৩ হাজার টাকা। স্বামী এবং এলাকার লোকজনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান। মোসাঃ লুৎফুননেছা একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি অষ্টম শ্রেণী পাস এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জননী। সমিতি, হাঁস-মুরগী পালন এবং সব্জী চাষের মাধ্যমে তার মাসিক আয় ১৫০০ টাকা। স্বামীর ব্যবসা সূত্রে মাসিক আয় ৫ হাজার টাকা। পারিবারিক প্রভাব এবং রাজনৈতিক পরিচিতি তাকে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে।

গেরদা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য রিজিয়া বেগম। তিনি ৫ম শ্রেণী পাস এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ের জননী। ব্যবসা সূত্রে স্বামীর বাৎসরিক আয় ৪০ হাজার টাকা। সমাজে পরিবারটির পরিচিতি তার নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। মোসাঃ মমতাজ বেগম একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি ৫ম শ্রেণী পাস এবং দুই ছেলে ও চার মেয়ে সন্তানের জননী। স্বামীর চাকুরী সূত্রে মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা। তিনি মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তার সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য তিনি গর্ব বোধ করেন। একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য রুবিয়া খাতুন অষ্টম শ্রেণী পাস এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জননী। কৃষি ও ব্যবসা সূত্রে স্বামীর বাৎসরিক আয় ৫০ হাজার টাকা। তার

স্বামীর সামাজিক প্রভাব তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। তিনি মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় তার সামাজিক মর্যাদা ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রওশন আরা ডিক্রিরচর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য। গবেষণাকালীন সময়ে তার অনুপস্থিতির কারণে তার অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য জমিলা খাতুন। তিনিও গবেষণাকালীন সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। নাহিদা বেগম ডিক্রিরচর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি এস.এস.সি পাস এবং এক ছেলে সন্তানের জননী। কৃষি সূত্রে স্বামীর মাসিক আয় ৪ হাজার টাকা। তার স্বামীর উৎসাহে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান।

কানাইপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য শামিমা বেগম এস.এস.সি পাস এবং তিন মেয়ে সন্তানের জননী। স্বামীর ব্যবসা সূত্রে বাৎসরিক আয় ৮০ হাজার টাকা। এলাকায় তার স্বামীর সামাজিক প্রভাব নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মোসাঃ জাহানারা বেগম। সমিতি, হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে তার নিজস্ব আয় ৪০০ টাকা এবং স্বামীর কৃষিকাজ ও পুকুর হতে মাসিক আয় মাসিক আয় ২ হাজার টাকা। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জননী। একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য মোছাঃ জোহরা বেগম অষ্টম শ্রেণী পাস এবং তিন ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জননী। হাঁস-মুরগী পালন ও সব্জী চাষের মাধ্যমে তার মাসিক আয় ৪০০ টাকা। কৃষিকাজের মাধ্যমে স্বামীর বাৎসরিক আয় ৩৬ হাজার টাকা। এলাকায় পারিবারিক পরিচিতি তার নির্বাচিত হওয়াকে প্রভাবিত করেছে।

নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য সোনাই বেগম। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে কেবল স্বাক্ষর করতে পারেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জননী। কৃষিকাজের মাধ্যমে স্বামীর মাসিক আয় ৩ হাজার টাকা। একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মোসাঃ হাসিনা বেগম। তিনি ৮ম শ্রেণী পাস এবং দুই ছেলে সন্তানের জননী। সমিতি ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে তার নিজস্ব আয় ৫০০ টাকা। স্বামীর চাকুরী সূত্রে মাসিক আয় ৪ হাজার টাকা। মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় নিজেকে তার কাছে সমাজের একজন সম্মানীত মানুষ বলে মনে হয় এবং নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় তার পরিচিতি বেড়েছে বলে তিনি জানান। মোসাঃ রহিমা খাতুন নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি ৮ম শ্রেণী পাস এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জননী। সমিতি ও স্বামীর কৃষি সূত্রে স্বামীর বাৎসরিক আয় ৫০ হাজার টাকা। পারিবারিক প্রভাব তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। নির্বাচিত হওয়ায় সমাজে তার সম্মান বেড়েছে এবং তিনি গর্ব বোধ করেন।

ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সমস্যা উদঘাটন, প্রাপ্ত সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

গবেষনায় এ পর্যায়ে নির্বাচিত নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য একটি প্রশ্ন পত্র তৈরী করা হয়। প্রশ্ন পত্রের মূল আলোচ্য বিষয় গুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

☐ কাজ করার ক্ষেত্র বা পরিবেশ।

☐ এলাকা ও বাজেট সম্পর্কে ধারণা।

☐ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বাধা সমূহ।

☐ ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশ গ্রহন।

☐ প্রশিক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ।

☐ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন।

☐ সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

এসকল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ব্যক্তি ভিত্তিক নির্বাচিত নারী সদস্যদের কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল-

আলিয়াবাদ ইউনিয়নের আলিয়া মাহমুদাকে মহিলা সদস্য হিসেবে তার কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, সবচেয়ে বড় সমস্যা তিনি মহিলা সদস্য হিসাবে তিনজন পুরুষ সদস্যের সমান এলাকার জন্য নির্বাচিত। অথচ কাজের সময় নির্দিষ্ট কোন কাজ পান না। তাই নির্বাচনের সময় গ্রামের জনসাধারণকে বিশেষ করে মহিলাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পুরণ করতে পারছেন না। ফলে ভবিষ্যতে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি অনিশ্চয়তা বোধ করেছেন। তার মতে মহিলাদের প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া উচিত। একই ইউনিয়নের হাসনা হেনা জানান, ইউনিয়নের রাস্তাঘাট খুব খারাপ থাকায় পরিষদের কাজে আসতে তার খুব সমস্যা হয়। এছাড়া পরিষদের মহিলা টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনের সমস্যা রয়েছে। তিনি মনে করেন এসব বিষয় সহ কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণের

ক্ষেত্রে মহিলাদের বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ মহিলা মেম্বারদের এলাকা বেশি। ভবিষ্যতে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি উৎসাহী। ফিরোজা খানম জানান, যেসব মহিলারা হেরে গিয়েছে বিভিন্ন ভাবে তাকে টিটকারী করেন। ছোটখাট যা কাজ পান তা করার সময় এলাকার বেকার ছেলেরা চাঁদা যায়। তার মতে ভাতা পুরুষদের চাইতে মহিলাদের তিন গুণ বাড়ানো দরকার। পারিবারিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তার কোন বাধা নেই বলে তিনি জানান।

ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের মোছাঃ মালেকা বেগম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের কাজে রাত্রে চলাফেরা করতে তিনি অসুবিধা বোধ করেন। তার মতে রাতেরবেলা মহিলাদের চলাফেরার নিরাপত্তার জন্য মহল্লাদার থাকা প্রয়োজন। একই ইউনিয়নের মোছাঃ পাপিয়া বেগম এর মতে পারিবারিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হলেও পরিষদের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা কাজ করতে গিয়ে নিরুৎসাহিত হন। কোন বড় ধরনের কাজ তাদেরকে দেয়া হয় না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। তার মতে, যা যা মহিলাদের নির্দিষ্ট এলাকার জন্য পুরুষদের প্রভাব ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট কাজ আলাদা করে দেয়া উচিত।

রাশিদা বেগম জানান, কাজ করার ক্ষেত্রে পারিবারিক বা সমাজিক কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন না। তবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের দায়িত্বে সুনির্দিষ্টতা না থাকায় কাজ করতে স্বস্তিবোধ করেন না। নিজের কোন কাজ করার স্বাধীনতা না থাকায় জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারছেন না। তার মতে ভাতা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বৃদ্ধি করা উচিত। কারণ তাদের সীমানা বেশি। একই ইউনিয়নের হালিমা বেগমকে পুনরায় নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, পরিবারের

কাজের সমস্যা সৃষ্টি করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে জনগণের জন্য কোন কাজ করতে পারছেন না বিধায় পুনরায় নির্বাচন করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অম্বিকাপুর ইউনিয়নের মরিয়ম বেগম জানান তিনি একজন মহিলা প্রতিনিধি হয়েও তার ওয়ার্ডের জনগণের জন্য কিছুই করতে পারেননি এবং উন্নয়নমূলক কোন কাজও করতে পারেননি। তিনি কাজের সুনির্দিষ্টকরণ সহ মহিলা সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন।

মোছাঃ আসমা বেগম চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য। তার মতে ইউনিয়নে কোন গ্রাম পুলিশ না থাকায় কাজ করতে অসুবিধা হয়। তিনি ইউএনও অফিস থেকে তাদের চিঠি সরাসরি তাদের হাতে দেয়ার সুপারিশ করেছেন। তার মতে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা উচিৎ। একই ইউনিয়নের সদস্য বেগম জয়তুন খাতুন জানান ইউনিয়ন পরিষদে সম্মানি ভাতা বকেয়া আছে। তিনি বলেন তাদের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের সদস্য মমতাজ বেগম জানান ইউপি সম্মানি ভাতা ঠিক মত পাওয়া যায় না। সম্মানি ভাতা বৃদ্ধি ও সরকারি বরাদ্ধ মহিলা সদস্যদের করা উচিত।তিনি বলেন মহিলা সদস্যদের জন্য সম্মানি ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত। তার মতে মহিলা সদস্যদের জন্য আলাদা সরকারি নীতি প্রনয়ন করা দরকার।

মাচ্চর ইউনিয়নের সদস্য শেফালী আক্তার বলেন তার ব্যক্তিগত কোন সমস্যা নাই এবং পারিবারিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ করতে কোন বাধার সম্মুখীন হন না। তার মতে ভাতা বৃদ্ধি করে দেওয়া খুবই জরুরী। চিঠি পত্র সরাসরি তার হাতে পৌঁছার পরামর্শ দেন তিনি। মোছাঃ সাজেদা বেগম জানান সামাজিক ভাবে কোন সমস্যা সম্মুখীন হন না। তবে সম্মানিভাতা খুব কম হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের কাজে আসা যাওয়া সহ

অন্যান্য কাজে তাদের অর্থ ব্যয় করতে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। ভবিষ্যতে তার নির্বাচন করার কোন ইচ্ছা নেই বলে জানান। রোকেয়া বেগম জানান ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কে তার কোন ধারনা নেই এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার মতামতের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কাজের জন্য কোন প্রকার প্রশিক্ষণও তিনি পাননি। তাই কাজ করার ব্যপারে তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

মোছাঃ আকলিমা বেগম জানান এপর্যন্ত তিনি এলাকার জনসাধারনের কাছে যে সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনটাই পূরন করতে পারেননি। এজন্য তাকে প্রায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ফেরদৌসী সুলতানা কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের সদস্য। তিনি জানান ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি চিঠি ঠিকমত পান না। তার মতে সভা গুলোতে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে নারী সদস্যদের মতামতের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একই ইউনিয়নের সদস্য নাছিমা জাফর জানান অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের সভা তারিখ তিনি ঠিকমত জানেন না। মাঝে মাঝে লোক মারফতে খবর পান। তিনি বলেন পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন সহযোগিতা পান না বরং কোন কোন সময় কটূক্তি শুনতে হয়। কৈজুরী ইউনিয়নের মহিলা সদস্য আজেদা বেগম জানান পারিবারিক বা সামাজিক ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন না। তবে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুই করতে পারছেন না বলে কাজ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তার মতে মহিলা সদস্যদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড আলাদা করে দেওয়া উচিত। একই ইউনিয়নের সদস্য জোসনা বেগম জানান ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে তার কোন পূর্ব ধারনা ছিলনা বলে কাজ

করতে খুব অসুবিধা হয়েছে। তিনি মহিলা সদস্যদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের ব্যপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন।

গেরদা ইউনিয়নের সদস্য রিজিয়া বেগম জানান মহিলা সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার সময় পুরষের তুলনায় অধিক পরিশ্রম করতে হয় কেননা তাদের এলাকা পুরুষদের তুলনায় বেশী। কিন্তু পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তাদেরকে করার সুযোগ দেওয়া হয় না। মমতাজ বেগম জানান নির্বাচনের সময় যতটা উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন এখন তা সম্পুর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন কারন তাদের কোন সুনির্দিষ্ট কাজ নেই। তারমতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মহিলা সদস্যদের জন্য কাজ সরকারী ভাবেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া। গেরদা ইউনিয়নের সদস্য রুবিয়া খাতুন কে তার সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান মহিলাদেরকে নির্বাচন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সেই সাথে কাজের পরিবেশের যে পরিবর্তন সাধন করা উচিত তা হয়নি। তিনি বলেন তারা কোথায় বসবেন, কি কাজ করবেন, কি তাদের সুবিধা কোন কিছুই নির্দিষ্ট নয়। তবে তিনি মনে করেন প্রথম বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় হয়তো এই সমস্যা হচ্ছে। সরকার নিশ্চই পরবর্তী সময়ে এসব সুযোগ সুবিধা দিকে দৃষ্টি দিবেন।

ডিক্রিরচর ইউনিয়নের সদস্য নাহিদা বেগম ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত বোধ করেন। তবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না বলে অনেক সময় এলাকার জনগণের বিভিন্ন নেতিবাচক কথা শুনতে হয়।

জাহানারা বেগম কানাইপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য । তার এলাকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেননি । তিনি বলেন কাজ করতে প্রায়ই নিরাপত্তার অভাববোধ হয় । তার মতে ইউনিয়নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা উচিত । জোহরা বেগম একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য । তিনি বলেন নির্বাচনের সময় অনেক ব্যয় হয়েছিল । কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের ভাতা খুব কম । সেজন্য পরিবারের জন্য তা থেকে ব্যয় করার কোন সুযোগই থাকে না । এজন্য পরিবারের সদস্যদের থেকে প্রায়শঃ নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় । তিনি আরো বলেন মহিলাদের জন্য একজন পুরুষ সদস্যের সমান সম্মানীভাতা মোটেই উপযোগী নয় । তার মতে একজন মহিলা সদস্যের তিন জন পুরুষ সদস্যের সমান সম্মানীভাতা প্রদান করা উচিত । তিনি রিলিফ সহ অন্যান্য সুবিধা জনগণের মাঝে বিতরণের ক্ষমতা সমানভাবে মহিলাদেরকেও দেওয়ার সুপারিশ করেন ।

নর্থ চেনেল ইউনিয়নের সদস্য সোনাই বেগম । তিনি বলেন ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশ নেই, সম্মানীভাতা কম এবং যাতায়াত ব্যবস্থা খুব সমস্যা । তিনি এ সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন এবং চিঠিপত্র সরাসরি নিজেদের হাতে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন । একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য হাছিনা বেগম জানান সালিশ কাজে মহিলা হিসাবে তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয় । তার মতে মহিলা সদস্যদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে আলাদা রুমের বসার ব্যবস্থা করা দরকার । এছাড়া তিনি এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার পরামর্শ দেন । মোছাঃ রহিমা খাতুন একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য । তিনি বলেন তিনটি ওয়ার্ডে যাতায়াত করে কাজের দেখা শুনা করায় তার খুব কষ্ট হয় । তিনি সম্মানীভাতা বৃদ্ধি

সহ কাজের সুনির্দিষ্ট করনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মহিলা সদস্যদের সঠিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করার জন্য আলাদা ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের সরাসরি নির্বাচন সরকারের একটি প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ অথচ তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা সদস্য প্রতিনিধিত্ব সমস্যার সমাধানে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। সরাসরি ভোটে পরিষদে গিয়েও এখন চেয়ারম্যানের পৃষ্ঠপোষকতার উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। একদিকে নারী সদস্যদের দায়িত্বের ব্যপারে সরকারী নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা অপরদিকে পুরুষ চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের পরিষদে মহিলা সদস্যদের উপর কতৃত্ব প্রবলভাবে বজায় রাখার প্রচেষ্টা মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা সদস্য সম্পৃক্ত করতে চায়না। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা যেমন স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারেননি, তেমনি পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে কার্যকরভাবে ক্ষমতার চর্চা করতে পারছেন না। নির্বাচিত নারী সদস্যরা জানান তারা ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করেন কিন্তু সেখানে তাদের মতামত গ্রহন করা হয় না । কেউ কেউ বলেছেন তাদের ঠিকমত সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য ডাকা হয় না । জরিপে দেখা যায় নারী সদস্যরা যে সব সমস্যার কথা তুলে ধরেন তার মধ্যে গুরুত্বহীন কিছু বিষয়ে সমাধান ব্যতীত কোনটিরও সমাধান করা হয় না ।

ইউপি সদস্যদের দায়িত্বসমূহ কী কী সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তাদের বেশীর ভাগই সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি । না জানার কারন হিসেবে তারা জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদ বা সরকার থেকে তাদের জানানো হয়নি। অনেকে বলেছেন অশিক্ষিত বলে জানেন না। এছাড়া তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি । নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে স্বল্প সংখ্যক মহিলা সদস্যদের এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ফলে অধিকাংশ মহিলা সদস্য জানেন না কীভাবে তারা দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে তাদেরকে পুরুষ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ধরনের নির্ভরশীলতা পুরুষদের অধিপত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা সদস্যরা চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অনিয়মের প্রতিবাদ ও নিজেদের মর্যাদার প্রশ্ন তুলতে সর্বদা ম্যানুয়ালের দোহাই দেয়। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির কারনে নারী সদস্যরা পুরুষ চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের মত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা পান না। এছাড়া নারী বিষয়ে কোন দলেরই কোন নীতিমালা ও ইস্যু নেই। সুতরাং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নের কথা থাকলেও নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতা মহিলা সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে ।

সামাজিক মর্যাদা তথা ইজ্জতের ক্ষেত্রেও নারী সদস্যরা নানাবিধা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কটুক্তি ইত্যাদি ছাড়াও অনেক সময় মহিলা সদস্যদের শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয় । এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা শ্লীলতাহানীসহ ধর্ষনের ঘটনাও ঘটেছে। গবেষণা এলাকার নারী সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে জানা যায় নারী সদস্যরা একটু উচ্চবাচ্য বা প্রতিবাদ করলে তাদের চরিত্র এবং

পারিবারিক জীবন নিয়ে টানাহেচড়া ও কটুক্তি করেছে পুরুষ সদস্যরা । অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান গ্রামের বাজারে । গ্রামের বাজারে মহিলাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা রয়েছে । এছাড়া যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারনে মহিলা সদস্যরা নিয়মিত সভায় উপস্থিত হতে পারে না। মহিলা সদস্যদের অনেকের নিজস্ব উপার্জন না থাকার কারণে নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে তাদের পক্ষে পরিষদের কার্যে দূরবর্তী কোন স্থানে যেতে অসুবিধা হয়। পরিষদের মহিলা সদস্যদের সরকারী তহবিল থেকে প্রতিমাসে ২০০ টাকা এবং পরিষদের তহবিল থেকে ২০০ টাকা মোট ৪০০ টাকা ভাতা প্রদানের বিধান রয়েছে । বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সরকারী তহবিল থেকে ২০০ টাকা পেলেও পরিষদের তহবিল থেকে প্রতিমাসে প্রাপ্য ২০০ টাকা ভাতা নিয়মিত পান না। গবেষণাধীন তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরা জানিয়েছেন, পরিষদের তহবিল থেকে নিয়মিত ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না । যে ভাতা সরকারী তহবিল থেকে পাওয়া যায় পরিষদে যাতায়াত খরচ বাবদ এটাকা ব্যয় হয়ে যায় । পরিবারের লোকজন এতে করে ভুল বুঝছে । ওয়ার্ডের দরিদ্র নারী-পুরুষরা বিভিন্ন সময়ে গম কিংবা আর্থিক সহায়তার জন্য এলে তাদের ফিরিয়ে দিতে হয় ফলে ভোটাররা সদস্যদের উপর অসন্তুষ্ট হয়।

মহিলা সদস্যদেরকে তিনটি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হতে হয়েছে । অথচ ঐ তিনটি ওয়ার্ডের জন্য প্রত্যেকটিতে আবার নির্দিষ্ট পুরুষ প্রতিনিধি রয়েছে । যারা ঐ ওয়ার্ডের সমস্ত দায়িত্ব পালন করছে এবং ক্ষমতা ভোগ করছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এতে মহিলাদের নির্বাচন ব্যয় এবং পরিশ্রম পুরুষদের তুলনায় বেশী হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ক্ষমতা নাই। পুরুষ নির্ভরশীলতা বিদ্যমান থাকায় নারী স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন

করতে পারছে না বা নারীদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পাচ্ছে না। কাজেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও পূর্বের মনোনয়ন ব্যবস্থা থেকে গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের জন্য আলাদা কোন বসার স্থান নেই । আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। সবমিলিয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছাড়া নির্বাচিত হওয়া তারা অর্থহীন মনে করছে ।

গবেষণা এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের যে সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা হলোঃ-

(১) প্রতিকূল পরিবেশে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ।

(২) অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন ।

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেট সম্পর্কে অবহিত না থাকা।

(৪) ভোট দাতাদের কাছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা।

(৫) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কোন প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই ।

(৬) অনেকে বলেছেন, তাদের স্বামীরা তাদের কাজে সহায়তা করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন অপবাদ দেয়ায় চেষ্টা করে ও কটুক্তি করে।

(৭) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের চাপ তথা প্রভাবের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন ব্যাহত হচ্ছে ।

(৮) নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে তাদের আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

(৯) সামাজিকভাবে সম্মান ও ইজ্জত ইত্যাদির বিষয়সমূহ তাদের অত্যন্ত নিরাশ করছে ।

(১০) বিবাহিত নারীরা শাশুড়ী ও ননদদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হন ।

(১১) ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বরাদ্দ এবং মালামাল বন্টনের কাজগুলো পুরুষ সদস্যরাই করতে চায়। এ বিষয়গুলো থেকে নারী সদস্যদের সরিয়ে রাখা হয়।

উল্লেখিত সমস্যা সমূহের কারণে তারা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের প্রতি নিরুৎসাহ বোধ করছেন এবং ভবিষ্যতে আর নির্বাচন করবেন কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে অধিকাংশই নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন । এদের বেশীরভাগের মন্তব্য হচ্ছে, পরিবারের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে যে প্রত্যাশা ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল তার যেহেতু কোনটাই পূরণ হচ্ছে না, তাই শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী ও সন্তানদের সেবা-শুশ্রুষা করে সম্পূর্নরূপে সংসারে মনোনিবেশ করাই ভাল। এ সমস্ত কারণে ভবিষ্যতে এরা আর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে কিনা তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

==========

পঞ্চম অধ্যায়

সমস্যা সমাধানের উপায় বা সুপারিশ ঃ

ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টির যথার্থ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসকল সমস্যা সমূহ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা দূরীকরনের জন্য গবেষণা এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যে উপায়সমূহ বা সুপারিশগুলি বের হয়ে এসেছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

(১) নির্বাচিত সদস্য হিসেবে নিজ এলাকা, এলাকার সমস্যা, এলাকার নারীদের সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধিকল্পে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বই, লিফলেট ও পোষ্টার সরবরাহ করা ।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে একজন নারী সদস্যের নিজের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে । এ জন্যে সরকারকে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে ।

(৩) সরকারীভাবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও নারী/পুরুষ সদস্যদের ভাতা সম্পর্কে জানানোর উদ্যোগ ও ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করে নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(৪) প্রার্থীদের নির্বাচনকালীন ব্যয়ের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচনী ইস্তেহারে সরকারকে সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমান উল্লেখ করে দিতে হবে ।

(৫) নারী সদস্যদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারকে নারী সদস্যদের কোটা সিস্টেম বা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৬) পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের উথাপিত সমস্যাকে সামান গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সরকারীভাবে নারীদের উথাপিত সমস্যাগুলোকে গুরুত্বসহকারে দেখা ও সমাধান করার নিয়ম করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী সদস্যদের বিভিন্ন সাব-কমিটির সভাপতি করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে নারী সভাপতির মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

(৭) নারী সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে যাতায়াতের জন্য সরকারীভাবে স্বতন্ত্র যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(৮) ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের দায়িত্ব/কাজের চিঠিপত্র সরাসরি ইউপি নারী সদস্যদের কাছে সরকারীভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

(৯) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(১০) ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বন্টনের প্রতিটি পর্যায়েই একজন নারী সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সকল কমিটিতে নারী সদস্যদের সদস্যপদ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং

তাদের উপস্থিতিতে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

(১১) সরকারকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নারী সদস্যদের সম্মেলনে তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া সরকারী প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ।

(১২) সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্যে সরকারীভাবে লিখিত কাজের তালিকা নারী সদস্যদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে ।

(১৩) ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের কাজের দায়িত্ব, কর্ম-কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্যে সরকারী এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(১৪) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের পারিবারিক বাধা দূর করা প্রয়োজন । সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পরিবারকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারে ।

(১৫) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও নারী সদস্যদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে ওয়ার্কসপ ও নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

(১৬) নারী সদস্যদের কর্মকান্ড গতিশীল করার জন্যে সবধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে ।

(১৭) বাজেট বরাদ্দ এবং বন্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ শুধু পুরুষের হাতে থাকলেই চলবে না নারীদের অংশটুকু সম্পূর্ন তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।

উল্লেখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ফলপ্রসু করা সম্ভব। আশার কথা ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মহিলাদের ক্ষমতায়নের যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ ব্যাপারে ২২শে আগষ্ট ২০০৪ সালের ডেইলি স্টার এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যেতে পারে যা নিম্নরূপ-

২৫/০৪/০২ ইং তারিখ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ৩১ জন পুরুষ কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসন থেকে ১০ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত এই ১০ জন দুইটি বিশেষ দল বি.এন.পি ও আওয়ামী লীগের অধিভূক্ত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ২৩/০৯/০২ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থা থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় যেখানে সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের থেকে আসনে নির্বাচিত মহিলা পৌরসভা কমিশনারদের ক্ষমতা ও কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত সীমিত করে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের আদমশুমারীতে অংশগ্রহণ বা জাতীয়তার প্রত্যয়নপত্র অনুমোদন করার অধিকার ছিল না। এছাড়া তারা বিভিন্ন সভায় তাদের উপস্থিতি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের থেকে কম সম্মানী পেতেন। এই প্রেক্ষিতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আদালতে একটি আবেদন দাখিল করা হলো।

এই প্রসঙ্গে ২০০৩ সালের ৩ মে তারিখে হাইকোর্ট (বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি জিনাত আরা) সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করল।

অন্তর্বর্তীকালীন এই আদেশের পরও, দায়িত্ব পালনের জন্য কম সম্মানী পাওয়া সহ, এই ১০ জন মহিলা কমিশনারদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত রইল।

'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' এবং 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' নামক দুইটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠারে হস্তক্ষেপে কোর্ট অনুল্লিলিখত এই সাংবিধানিক প্রশ্নের মতামত প্রদানের জন্য সিনিয়র আইনজীবি ডঃ কামাল হোসেনকে অনুরোধ জানায়।

রায়ঃ সকল পক্ষের শুনানী শেষে, বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক ও বিচারপতি মিফতাউদ্দিন চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের পক্ষে রায় প্রদান করে।

সমতা নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়ন ও এর ধর্মীয় ও সাংবিধানিক মূল ধাপের ভিত্তিগুলো কোর্ট চিহ্নিত করে।

এটা সংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বকে নিশ্চিত করে ও বিস্তৃতভাবে সংবিধানের ২৭, ২৮, ১০ ও ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাক্রমে আইনের বিচারে সাম্য, লিঙ্গবৈষম্যের নিষেধাজ্ঞা, জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সরকার আইনের বর্ণনা দৃঢ় করে [সূত্রঃ ডেইলি স্টার, ২২শে আগষ্ট ২০০৪]।

উপসংহার

নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়নের পূর্বশর্ত। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ সংস্করণ হিসাবে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করার মাধ্যমে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি বা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য মূল উদ্দেশ্য যে অপূর্ণ রয়ে গেছে তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়। সামাজিক বাধা এবং কুসংস্কার গ্রামাঞ্চলে নারীদের ঘরের বাইরে এসে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সুতরাং গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে নারী সদস্যরা কোন না কোন ভাবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন। প্রথমবারের মত নির্বাচিত হওয়া এবং নারী সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য নতুনভাবে চিহ্নিত করার কারণে নারী সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। এসব প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার কারণে ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় ইউপি নারী সদস্যদের যতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখার কথা ছিল ততটুকু রাখতে পারছেন না।

“স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন” শীর্ষক গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন পূরণ পদ্ধতি, ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদ, দলীয় আলোচনা এবং অন্যান্য লেখক ও তাত্ত্বিকগণের লিখিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যম দেখা যায় যে, আমার এলাকার নারী ও পুরুষ

সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধমে যে ফলাফল বের হয়ে এসেছে তার সাথে অন্যান্য লেখক এবং তাত্ত্বিকগণের বর্ণিত বিষয়সমুহের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় মাধ্যম হতে সাধারণ ভাবে নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দান, ভাতা বৃদ্ধি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সমূহ নির্দিষ্টকরণ, বাজেট এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, সভা, বিচার সালিশ ইত্যাদিতে নারীদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া, গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে ইউনিয়নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সুপারিশসমূহ বের হয়ে এসেছে। তবে অন্যান্য লেখকদের লেখা ও গবেষণায় নারীর শারীরিক নির্যাতনের যে বিষয়সমূহ উল্লেখ্য করা হয়েছে আমার গবেষণা এলাকায় তা একেবারেই অবর্তমান। অর্থনৈতিক ভাবে অত্র এলাকার নারী সদস্যদের পরিবারগুলি মোটামুটি স্বচ্ছল এবং বেশির ভাগ মহিলা সদস্য পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। সাংসারিক কাজ ব্যতীত এই এলাকার নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ করতে পরিবারের সদস্য কর্তৃক বা সামাজিক ভাবে কোন বাধার সম্মুখীন হন না। তবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারছেন না বলে প্রায়শঃ এলাকার জনগণের কটুকথা শুনতে হয়। এরা প্রত্যেকেই নির্বাচিত হতে পেরে আনন্দিত। নির্বাচিত হওয়ার ফলে তাদের সামাজিক সম্মান ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তারা জানান। তাদের মতে প্রথম বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় হয়ত তাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হলে তারা প্রত্যেকেই ভবিষতে নির্বাচন করতে আগ্রহী।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যার ভিত্তিতে তা সমাধানের উপায় হিসেবে বেশ কিছু সুপারিশ বের হয়ে

এসেছে। যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারীভাবে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভাতা সম্পর্কে নারী সদস্যদের জানানো, ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিয়মিত সকল সদস্যকে প্রদানের ব্যবস্থা করা, নিজ এলাকার সমস্যা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বই, লিফলেট, পোস্টার সরবরাহ করা, বাজেট ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, কোটা সিষ্টেম বা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়ার নীতিমালা প্রণয়ন, নারী সদস্যদের সভা ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য স্বাতন্ত্র্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা, নারী সদস্যদের জন্য দেয়া সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে গবেষণায় মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কাজে লাগিয়ে নারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুললে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ হবে এবং তারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

==============

পরিশিষ্ট

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মহিলা সদস্যদের পরিচিতিঃ

নাম	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন	উপজেলা
১. আলিয়া মাহমুদা	বিলমামুদপুর	১	আলিয়াবাদ	ফরিদপুর সদর
২. হাসনা হেনা	সাদিপুর	২	”	”
৩. ফিরোজা খানম	আলীয়াবাদ	৩	”	”
৪. মোছাঃ মালেকা বেগম	দূর্গাপুর	১	ঈশানগোপালপুর	”
৫. মোছাঃ হেনা বেগম	চাঁদপুর	২	”	”
৬. মোছাঃ পাপিয়া বেগম	চর নশিপুর	৩	”	”
৭. রাশিদা বেগম	পূর্ব ভাষাঞ্চল	১	অম্বিকাপুর	”
৮. হালিমা বেগম	অম্বিকাপুর	২	”	”
৯. মোহাম্মদ মরিয়ম বেগম	কোমলপুর	৩	”	”
১০. মোসাঃ মমতাজ বেগম	আনছার কাজীর ডাংগী	১	চরমাধবদিয়া	”
১১. মোছাঃ আছমা বেগম	চরবালুধুম	২	”	”
১২. মোসাঃ জয়গুন খাতুন	গোপালখাঁর ডাংগী	৩	”	”
১৩. মোছাঃ সাজেদা বেগম	ধুলদী রাজাপুর	১	মাচ্চর	”

নাম	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন	উপজেলা
১৪. মোছাঃ রোকেয়া বেগম	পরানপুর	২	”	ফরিদপুর সদর
১৫. শেফালী আক্তারী	গেন্দিয়া	৩	”	”
১৬. মোসাঃ আকলিমা বেগম	মহারজপুর	১	কৃষ্ণনগর	”
১৭. ফেরদৌসী সুলতানা	ভূয়ারকান্দি	২	”	”
১৮. নাছিমা জাফর	ভাবুকদিয়া	৩	”	”
১৯. আজেদা বেগম	কবিরপুর	১	কৈজুরী	”
২০. জোসনা বেগম	সাচিয়া	২	”	”
২১. মোসাঃ লুৎফুননেছা	ইছাইন	৩	”	”
২২. রিজিয়া বেগম	কাফুরা	১	গেরদা	”
২৩. মোসাঃ মমতাজ বেগম	বাখুন্ডা	২	”	”
২৪. রুবিয়া খাতুন	কেশব নগর	৩	”	”
২৫. রওশন আরা	- -	১	ডিক্রিরচর	”
২৬. জমিলা খাতুন	- -	২	”	”
২৭. নাহিদা বেগম	খিদির বিশ্বাসের ডাংগী	৩	”	”
২৮. শামিমা বেলাল (ডলি)	লক্ষীপুর	১	কানাইপুর	”
২৯. মোছাঃ জাহানারা বেগম	মৃগী	২	”	”
৩০. মোছাঃ জোহরা বেগম	রনকাইল	৩	”	”

নাম	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন	উপজেলা
৩১. সোনাই বেগম	সালামখাঁর ডাংগী	১	নর্থ চ্যানেল	ফরিদপুর সদর
৩২. মোসাঃ হাসিনা বেগম	জলিল সরদারের ডাংগী	২	”	”
৩৩. মোসাঃ রহিমা খাতুন	নতুন ডাংগী	৩	”	”

অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সন্তান সংখ্যা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সন্তান সংখ্যা
১. আঞ্জিয়া মাহ্মুদা	২৭	এস.এস.সি	২
২. হাসনা হেনা	৩৫	"	৩
৩. ফিরোজা খানম	৪০	অষ্টম শ্রেণী	৪
৪. মোছাঃ মালেকা বেগম	৪০	এস.এস.সি	৬
৫. মোছাঃ হেনা বেগম	--	--	--
৬. মোছাঃ পাপিয়া বেগম	২৬	এস.এস.সি	২
৭. রাশিদা বেগম	৪০	এইচ.এস.সি	২
৮. হালিমা বেগম	৪৯	৪র্থ শ্রেণী	
৯. মোহাম্মদ মরিয়ম বেগম	৪০	৫ম শ্রেণী	৩
১০. মোসাঃ মমতাজ বেগম	৪০	৮ম শ্রেণী	৩
১১. মোছাঃ আছমা বেগম	২৫	এস.এস.সি	১
১২. মোসাঃ জয়গুন খাতুন	৪০	স্বাক্ষর জ্ঞান	২
১৩. মোছাঃ সাজেদা বেগম	২৮	৮ম শ্রেণী	২
১৪. মোছাঃ রোকেয়া বেগম	৩১	বি.এ	২
১৫. শেফালী আক্তারী	২৮	বি.এ	১
১৬. মোসাঃ আকলিমা বেগম	২৮	এস.এস.সি	১
১৭. ফেরদৌসী সুলতানা	২৮	এইচ.এস.সি	১
১৮. নাছিমা জাফর	৩৫	৯ম শ্রেণী	৪
১৯. আজেদা বেগম	৩৮	এস.এস.সি	২
২০. জোসনা বেগম	৩২	৫ম শ্রেণী	৪
২১. মোসাঃ লুৎফুননেছা	৩২	৮ম শ্রেণী	৩

নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সন্তান সংখ্যা
২২. রিজিয়া বেগম	৩৮	৫ম শ্রেণী	৩
২৩. মোসাঃ মমতাজ বেগম	৪২	৫ম শ্রেণী	৬
২৪. রুবিয়া খাতুন	৩০	৮ম শ্রেণী	৩
২৫. রওশন আরা	--	--	--
২৬. জমিলা খাতুন	--	--	--
২৭. নাহিদা বেগম	২৬	এস.এস.সি	১
২৮. শামিমা বেলাল (ডলি)	৩২	"	৩
২৯. মোছাঃ জাহানারা বেগম	২৮	"	৩
৩০. মোছাঃ জোহরা বেগম	৩৫	৮ম শ্রেণী	৪
৩১. সোনাই বেগম	৩৫	স্বাক্ষর জ্ঞান	৪
৩২. মোসাঃ হাসিনা বেগম	৩০	৮ম শ্রেণী	২
৩৩. মোসাঃ রহিমা খাতুন	৩২	৮ম শ্রেণী	২

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পুরুষ সদস্যদের পরিচিতিঃ

নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন
মোঃ ইসহাক সেক	মোঃ রিয়াজউদ্দিন শেখ	মেছের খার পাড়া	২	ঈশানগোপালপুর
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	মোঃ আলাউদ্দিন সিকদার	চলু মাতুব্বরের পাড়া	৩	"
মোঃ আজগর হোসেন	মোঃ আফছার হোসেন	পশ্চিম মল্লিক পাড়া	৫	"
মোঃ কুদ্দুস শেখ	মৃত তাহের শেখ	আইনদ্দীন মুন্সীর পাড়া	৮	"
মোঃ সাজাহান মোল্লা	আব্দুল লতিফ মোল্লা	পূর্ব গংগাবদী	১	কৈজুরী
মোঃ মান্নান শেখ	শেখ আহম্মদ আলী	মুরারীদহ	২	"
মোঃ রতন মিয়া	মৃত হুদন মিয়া	হাড়োকান্দি	৪	"
আঃ হালিম চোকদার	মৃত গনি চোকদার	কালারায়ের	৬	"
আবদুল গফুর মোল্লা	মৃত বছিরদ্দী মোল্লা	কুজুরদিয়া	৯	"
খোন্দকার আঃ অদুত	খোন্দকার আঃ মালেক	দেওড়া	১	গেরদা
শাহ্ রেজাউল করিম	শাহ্ মোঃ ইদ্রিস	গেরদা	৩	"
আঃ লতিফ মোল্লা	মৃত আহম্মদ মোল্লা	পশরা	৪	"
জলিল শেখ	মোঃ নাছিম মাতুব্বর	ইব্রাহিমদী	১	কানাইপুর
আঃ মোতালেব শেখ	মৃত ওমেদ শেখ	ভাটিকানাইপুর	২	"
খোকন মাতুব্বর	নুরউদ্দিন মাতুব্বর	শোলাকুন্ড	৫	"
মোঃ মালেক মাতুব্বর	মৃত ইজাহার মাতুব্বর	কাশিমাবাদ	৮	"

401831

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ওয়ার্ড	ইউনিয়ন
আঃ সাত্তার সেক	সেক খোরশেদ	আঃ রহমান ডাংগী	১	আলিয়াবাদ
আঃ রাজ্জাক	মোহাম্মদ প্রামানিক	ভাজনা ডাংগী	৪	"
মোঃ আছাদুজ্জামান	সুজাত আলী ব্যাপারী	মফিজুদ্দিন বেপারীর ডাংগী	১	চর মাধবদিয়া
মোঃ জিন্না খান	মৃত আমীর আলী	মফিজুদ্দিন বেপারীর ডাংগী	২	"
মোঃ আঃ রশিদ সেক	গৈয়দ্দিন সেক	ওয়াজুদ্দিন ফকিরের ভাংগী	৫	"
লুৎফর রহমান	মৃত আঃ বারেক মন্ডল	একরাম মতুবারের ডাংগী	৭	"
আঃ কাদের	ফেলু শেখ	দঃ চর মাধর্বদিয়া	৮	"
ইদ্রিস চৌধুরী	আঃ জলিল	চৌধুরী ভাংগী	৯	"

নারী সদস্যদের প্রতি প্রশ্নসমূহ ঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের কী কী কাজ করতে হয়?

২. সভাগুলোতে কী কী করতে হয়?

৩. সভায় যাওয়া-আসা করতে অসুবিধা হয় কি?

৪. সভায় একা যান না- কি পরিবারের অন্যকেই সাথে যায়?

৫. আপনার বদলে অন্য কেউ সভায় উপস্থিত হয় কি?

৬. ইউনিয়ন পরিষদের কাজে পারিবারিক বাধা ও সমস্যা হয় কি?

৭. ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সামাজিক বাধা ও সমস্যা হয় কি?

৮. ইউনিয়ন পরিষদের কাজে রাজনৈতিক বাধা ও সমস্যা হয় কি?

৯. ইউনিয়নের অন্যান্য নারী সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

১০. ইউনয়ন পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনি বা অন্য কোনো নারী সদস্যকে কোনো রকম নির্যাতন/হুমকির শিকার হতে হয়েছে কি?

১১. হলে কী ধরনের নির্যাতন বা হুমকি?

১২. এর কোনো প্রতিকার হয়েছে কি?

১৩. ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে কাজের ক্ষেত্রে কী ধরনের সহযোগিতা পান?

১৪. ইউনিয়ন পরিষদের কাজে যে সমস্ত অর্থ/চাল/গম/অন্যান্য মালামাল বরাদ্দ করা হয় সেগুলো কিভাবে সংগ্রহ ও বিতরণ করেন?

পুরুষ সদস্যদের প্রতি প্রশ্ন সমুহ ঃ

১. এবারে নির্বচনে নারী প্রার্থীদের সরাসরি অংশ গ্রহণ ও নির্বাচিত হওয়া কেমন লাগছে?

২. এক সাথে নারী ও পুরুষ কাজ করছেন বিষয়টি কেমন লাগছে?

৩. ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ কেমন?

৪. ইউনিয়ন পরিষদের সভাগুলোতে নারী সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত হতে পারেন কি?

৫. তারা তাদের এলাকার সমস্যা/দাবী দাওয়া সভায় উপস্থাপন করতে পারেন কি?

৬. নারী সদস্যরা প্রধানত কী কী ধরনে সমস্যা সভা তুলে ধরেন?

৭. নারী সদ্যদের উথাপিত সমস্যা/ দাবী দাওয়া সমাধানে আপনাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা চান কী?

৮. আপনারা তাদের কিভাবে সহযোহিতা করেন?

৯. ইউনিয়ন পরিষদের কাজে অর্থ/চাল /গম/ অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি সংগ্রহ থেকে বিতরণ পর্যন্ত আপনরা কিভাবে দায়িত্ব পালন করেন?

১০. নারী সদস্যরা কিভাবে এই কাজগুলো করেন?

১১. আপনাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সালিশ/বিচার ব্যবস্থা কি রকম হয়?

১২. আপনার সেখানে কিভাবে অংশ গ্রহণ করেন?

১৩. সালিশ/বিচারে নারী সদস্যদের সম্পর্ক কেমন?

১৪. আপনার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সালিশ/বিচারে কী ভূমিকা পালন করেন?

১৫. চেয়ারম্যানের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?

১৬. চেয়ারম্যানের সাথে নারী সদস্যদের সম্পর্ক কেনম?

১৭. এলাকায় কাজ করতে গিয়ে নারী সদস্যরা কোন সমস্যার মুখোমুখি হন কিনা?

১৮. এলাকার জনগণ নারী সদস্যদের সাথে কি ধরনে আচরন করে?

১৯. ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে উদ্দোগ নেয়া হয়েছে তা আপনার মতে কতটুকু সফল হয়েছে?

২০. এর ফলে নারীদের অবস্থা কোন পরিবর্তন হয়েছে বা হবে কি?

গ্রন্থপঞ্জী

রচয়িতা	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
ডঃ কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত)	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট আগারগাঁও, ১৯৮৯।
Dr. Kamal Siddique(Edited)	Local Government in Bangladesh	National Institute of Local Government 49, New Eskaton Road Dhaka-2, 1984.
Dr. Kamal Siddique	Local Governance in Bangladesh	The University Press Ltd., Dhaka, 2000.
মাহমুদা ইসলাম	নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন	জে.কে.প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা। এপ্রিল, ২০০২।
তাহমিনা আক্তার	মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	বাংলা একাডেমী জুন, ১৯৯৫।

মেঘনা গুহঠাকুরতা সুরাইয়া বেগম হাসিনা আহম্মেদ	নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি	সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ১১০৭ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী, ১৯৯৭
সিদ্দিকুর রহমান মিয়া	ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা, ১৯৮৩ এবং গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন।	বাংলাদেশ 'ল' বুক কোম্পানী। ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৭
নূর হোসেন মজিদী	নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে	কনফিডেন্ট পাবলিকেশন (প্রাঃ) লিঃ ১৩১ ডি. আই. টি এক্স. রোড, ঢাকা। মে, ১৯৯৯।
সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত)	নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন	জেন্ডার গ্রন্থমালা-১ মাওলা ব্রাদার্স,২০০৩
নীলুফার বেগম আব্দুল্লাহ এম. খান সাইফুদ্দীন আহমদ	লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক ভাবনা	এফ. রহমান ৪৬/১, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

তোফায়েল আহমদ	বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার	গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।
গাজী শামসুর রহমান	বাংলাদেশের সংবিধানের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য	পল্লব পাবলিশার্স ডিসেম্বর, ১৯৯১।
আনসার আলী খান	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং গ্রাম সরকার আইন-২০০৩।	কামরুল বুক হাউস ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।

- বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড-৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩।

- ক্ষমতায়নে নারী, পলিসি লিডারশীপ এ্যান্ড এ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইকুয়্যালিটি (প্লাজ)।

- নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষণা ও পাঠ্যক্রম, মার্চ ১৯৯৫।

- বাংলাদেশ গেজেট, জানুয়ারী ২১, ১৯৯৮।

- নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ইউ এন ডি পি রিপোর্ট অন হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ - ১৯৯৪।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার কমিশন, ১৯৯৭।

- প্রথম আলো, স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিরা কি করতে পেরেছেন, ১৮ ডিসেম্বর ২০০২।

- আজকের কাগজ, ইউপি নির্বাচনে নারী প্রার্থী, ২৫ ডিসেম্বর ২০০২।

- মানব জমিন, মহিলা ইউপি সদস্যদের হাতে ক্ষমতা নেই, ২২ জুন ১৯৯৯।

- সংবাদ, প্রকাশিত নারী প্রতিবেদন, ২৬ জুন ১৯৯৯।

- জনকণ্ঠ, নারী প্রতিবেদন, ১৭ মে ১৯৯৯।

- Daily Star, Local Government Circular Discriminatory and Unconstitutional, 22 August 2004.

=========